ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী

আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক

ফুরফুরার পীর হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী

ফুরফুরার পীর হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী

আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ফুরফুরার পীর
হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী
আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন
ইফা প্রকাশনা ৬০
প্রকাশক
অধ্যাপক এ, এস, এম, ওমর আলী
সহকারী পরিচালক
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা বিভাগ
বায়তুল মুকাররম (তেতলা), ঢাকা—২
প্রথম সংস্করণ
শাবান, ১৪০০
আষাঢ়, ১৩৮৭
জুন, ১৯৮০
প্রচ্ছদ : কাজী আসাদুজ্জামান
মুদ্রক
স্বাতী মুদ্রায়ণ
৫৫ পাতলা খান লেন
ঢাকা—১
মূল্য : সাত টাকা মাত্র

FURFURAR PEER
HAZRAT MAULANA ABU BAKR SIDDIQUI
(Life Story of Maulana Abu Bakr Siddiqui) : The Pir of Furfura) : Written by Abu Fatema Muhammad Ishaque and published by Islamic Cultural Centre, Dacca Division, Islamic Foundation Bangladesh. Dacca—2
Price : Taka Seven only.

আমাদের কথা

ফুরফুরার পীর পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) এ দেশের ধর্মীয় ইতিহাসে একটি সুপরিচিত নাম। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ শুধুমাত্র ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মুসলিম জনগণের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের দিকেও ছিল তাঁর সমান নজর। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণের যে উত্তাল জোয়ার দেখা যায়, তার অন্যতম অগ্রনায়ক ছিলেন 'ফুরফুরার পীর' নামে খ্যাত এই মরহুম মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী।

জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগমনের স্বার্থেই জাতি তার বীরদের গৌরবগাথা স্মরণ করে। অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দারিদ্র্য ও কুসংস্কারের অতল গহ্বরে এদেশের মুসলিম জনগণ যেদিন চিরতরে হারিয়ে যেতে বসেছিল, সেদিন তাদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জাগরণের বাণী শুনিয়ে যিনি তাদের মুক্তি পথের দিশা দিয়েছিলেন, আজকের দিনে তাঁকে আমরা স্মরণ করছি আমাদের স্বার্থে, আমাদেরই প্রয়োজনে। রব্বুল আলামিন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দা সম্বন্ধে আমাদের এক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন, আজকের দিনে এটাই আমাদের মোনাজাত।

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,
ঢাকা ঃ ১, ৭, ৮০

আবদুল গফুর
আবাসিক পরিচালক

দুটি কথা

বাংলাদেশ ও আসামের মুসলিম ধর্মাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুরফুরার প্রখ্যাত পীর হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকীর একটি জীবনী লেখার আমার ইচ্ছা ছিল। বিগত কয়েক বছর যাবত আমি তাঁর জীবনের টুকরা টুকরা কথা নোট করে করে জমা করতে থাকি। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত মরহুম মওলানা রুহুল আমিন সাহেবের বিভাগ-পূর্ব যুগে লিখিত হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনীর একটি পুরাতন কপি আমার হাতে এসে পড়ে। এই বই থেকেও আমি বহু মাল-মশলা কুড়িয়ে নিয়েছি। শর্ষিণা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'তাবলীগের' বিশেষ সংখ্যাগুলো ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক নেদায়ে ইসলামের বিশেষ বিশেষ সংখ্যা থেকেও আমি এই জীবন-কথার বহু উপকরণ সংগ্রহ করেছি। মরহুম ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবের 'ইসলাম প্রসঙ্গ' বইটিও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। মহান পুরুষের এই জীবনী লিখতে গিয়ে কোনরূপ বেআদবী করছি কিনা এই ভয়ও মনে রয়েছে। সকল রকমের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁর বেহেশতী আত্মার কাছে ক্ষমা চাইছি এবং সকল দোষ-ত্রুটি মাফ করে বইটি কবুল করে নেবার জন্য রব্বুল আলামিন আল্লাহ্‌র দরগাহে সবিনয় প্রার্থনা করছি।

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, বইটি প্রকাশ করে কেবল আমার নয় সকল বাংলাদেশীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এই বই প্রকাশনা সংস্থার সকল কর্মচারীর প্রতি রইলো আমার আন্তরিক তাষিম ও ইকরাম।

আল্লাহ্‌ আলেমুল গায়্‌ব।

ইতি

তাং আষাঢ়, ১৩৮৭
শাবান, ১৪০০ হিজরী

আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক
সাহিত্য কুটীর ঃ বয়ই বাড়ী
ডাকঘর ঃ কুমারুলী
জিলা ঃ মোমেনশাহী।

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	বাল্যজীবন ও শিক্ষা-জীবন	৯
২।	ফুরফুরা শরীফের ইতিকথা ও হযরত পীর সাহেবের বংশ পরিচয়	১৪
৩।	হযরত মওলানা আবূবকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর পীর হযরত শাহসূফী ফতেহ আলী (রঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৮
৪।	তবলীগ ও তন্‌যীম	২৪
৫।	কর্মজীবনের একটি বিশিষ্ট দিক	৩৪
৬।	হযরত পীর সাহেবের তাকওয়া ও পরহেজগারী	৪১
৭।	কাশ্‌ফ ও কারামত	৪৯
৮।	বুজর্গী, কামালাত, উচ্চ দরজা ও মুজাদ্দিদের মর্যাদালাভ সম্পর্কিত কতিপয় বর্ণনা	৫৭
৯।	বুজর্গানে দীনের মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর	৬৩
১০।	পীর সাহেবের মহৎ ও জনহিতকর কার্যাবলী	৬৫
১১।	আমল-আখলাক-স্বভাব চরিত্র	৭২
১২।	অছিয়তনামা	৮০
১৩।	ইনতিকালের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দৃশ্যাবলী	৯৩
১৪।	পীরজাদা ও পীরজাদীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১০১
১৫।	হযরত পীর সাহেবের তরীকতের শেজরা	১০৫
১৬।	একটি মহত্তম ব্যক্তিত্বের অবসান	১০৬

বাল্যজীবন ও শিক্ষা-জীবন

হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দীকী (রঃ) জন্মগ্রহণ করেন বিগত বাং ১২৬৫ সনের ফাল্গুন মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রাক্তন বালিয়া বাসন্তী গ্রামে যেখানে চার শহীদের মাজার অবস্থিত—যে জন্য পরবর্তীকালে এ জায়গার নাম দেওয়া হয়েছিল ফায়রে ফারাহ্ কিংবা ফর্ফরাহ্ এবং তা থেকে আরো পরবর্তীকালে হযরতে ফুরফুরা,—হযরত ফুরফুরা থেকে ফুরফুরা শরীফ হয়েছে।

মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) এর পিতা হাজী মৌলবী মখদুম আবদুল মোক্তাদেরও ছিলেন একজন আত্মিক প্রজ্ঞার অধিকারী বিশিষ্ট 'ওলি'। জন্মের নয় মাস পরেই তিনি পিতৃহারা হয়ে স্নেহময়ী আম্মা মহব্বতুন্নেসা খাতুনের কোলে লালিত পালিত হন। সে সময় রাজ-ভাষা ইংরেজীর মর্যাদা ছিল সর্বাধিক; আর তিনি তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন বলে লোকে তাঁকে ইংরেজী শিখতে উৎসাহী করে। আবুবকর সিদ্দিকী লোকের উৎসাহে ইংরেজী শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তাঁর ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ মরহুম হযরত মওলানা হাজী মোস্তফা মাদানী (রঃ) স্বপ্নযোগে তাঁকে ইংরেজী শিখতে নিষেধ করেন। তখন তিনি ইংরেজী ছেড়ে দিয়ে আরবী ফারসী প্রভৃতি ভাষায় ধর্মীয় শিক্ষা লাভে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে তিনি সিতাপুর মাদ্রাসায় এবং পরে হুগলী মোহ্ছেনিয়া মাদ্রাসাতে আরবী ভাষা অধ্যয়ন করেন। সেখান থেকে 'জমাতে উলা' পাস করে কলকাতা সিন্দুরিয়া পট্টী মসজিদে মওলানা হাফেজ জামাল উদ্দীন সাহেবের কাছে হাদিস ও ফেকাহ্ পবিত্র কুরআনের ভাষ্য সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থাদি পাঠ শেষ করেন। হাফেজ মওলানা জামাল উদ্দীন সাহেব ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদ সৈয়দ আহমদ বেরেলবি (রঃ) এর খাস্ খলিফা (প্রতিনিধি) ও প্রধান মুজাহিদ।

তারপর তিনি না-খোদা মস্‌জিদে হযরত মওলানা বেলায়েত (রঃ) এর কাছে মন্তেক ও হিকমত প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং অসাধারণ ধী-শক্তির জন্য তেইশ-চব্বিশ বৎসরের মধ্যেই ইসলামী শাস্ত্র ও ইসলামী শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। এর ফলে তাঁর বিদ্যাবত্তা বা ইল্‌মিয়াতের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তিনি মক্কা ও মদীনা শরীফ যেয়ে পড়াশুনা করেন এবং সহিহ বুখারী ও মুস্‌লিম প্রভৃতি চল্লিশটি হাদিস গ্রন্থের সনদ লাভ করেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রওজা শরীফের মুজাবির[১] হযরত সৈয়দ মওলানা শায়খোদ-দালায়েল আমিন রেজওয়ান তাঁকে এই সনদ প্রদান করেন। তিনি (হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ) নিম্নোক্ত চল্লিশটি হাদিস-গ্রন্থের সনদ লাভ করেছিলেন ঃ—

(১) সহিহ বুখারী, (২) সহিহ মুসলিম, (৩) সুনানে আবু দাউদ, (৪) সুনানে তিরমিজি, (৫) সুনানে নাসায়ী, (৬) সুনানে ইব্‌নে মাজা, (৭) মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, (৮) মুস্‌নাদে ইমাম আবুহানিফা, (৯) মুস্‌নাদে ইমাম শাফেয়ী, (১০) মুসনাদে ইমাম আহমদ, (১১) মুসনাদে দারমি, (১২) মুস্‌নাদে তায়ালসি (১৩) মুসনাদে আবুদ ইব্‌নে হোমায়েদ, (১৪) মুসনাদে হারিছ ইবনে উসামা, (১৫) মুসনাদে বাজ্জাজ (১৬) মুসনাদে আবুইয়ালী মুসেলী, (১৭) সহিহ ইব্‌নে হাব্বান, (১৮) সহিহ ইবনে খোজায়মা, (১৯) মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, (২০) মিশ্‌কাতুল আনওয়ার লিশ-শায়খিল আকবর, (২১) সুনানে আবু মুস্‌লেমিল কাশি, (২২) মুস্‌নাদে সঈদ ইবনে মনসুর, (২৩) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, (২৪) সুনানে বায়হাকিয়ে কোব্‌রা (২৫) তারিখে ইব্‌নো আসাকের, (২৬) তারিখে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মঈন, (২৭) শেফায়ে-কাজি ইয়াজ, (২৮) শারহিইস সুন্নাহ্‌ লিল বাগাবি, (২৯) আয-যাহ্‌দো আদ্‌দাকায়েক লেইব্‌নে মোবারক, (৩০) নাওয়াদিরুল ওসুল লিল্‌ হাকিমিত্‌ তিরমিজি, (৩১) কিতাবুদ দো'য়া লিত্‌ তিবরানি, (৩২) আক্‌সোল ইল্‌মে ওয়াল আ'মালে লিল খতিব, (৩৩) মোস্‌তাখরিজে ইস্‌মাইলি আলা সহিহিল বুখারি, (৩৪) মুস্‌তাদরিক লিল হাকিম, (৩৫) আলফারাজো বাদাশ্‌ শিদ্দাহ্‌ লে ইবনে আবিদুনিয়া, (৩৬) মুস্‌তাখরিজে আবিওয়ানা আলা সহিহিল

১. মুজাবীর ঃ—খাদেম, দরগাহের সেবায়েত, প্রতিবেশী

মুস্‌ফিক, (৩৭) হুলইয়া লে আবি নঈম, (৩৮) যিয়াদুল মোসানেদ্‌ মকালাতে লে জালাল উদ্দিন সিউতি, (৩৯) আজ্‌জুর্‌রিয়াতুত্‌ তাহেরা, (৪০) আমালুল ইয়াওম ওয়াল্‌লায়লাতে লে আবিস্‌সুন্‌নি।

এরপরেও দেশে ফিরে বহু দুর্লভ কিতাবাদি সংগ্রহ করে তিনি একাদিক্রমে আঠার বছর পড়াশোনা করেন। তিনি ইল্‌মে জাহেরী ছাড়া ইল্‌মে বাতেনীও হাসিল করেছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় হুগলী মাদ্রাসা বোর্ডিং অবস্থান করার সময়ও চার তরিকার নিয়মানুযায়ী অধিকাংশ রাত্রিতে জিকির করে করে তিনি বেহুশ হয়ে যেতেন—রাত্রিতে বহু বোজর্গের গোর জিয়ারত করে বেড়াতেন। অনেক সময় রাত্রিতে জিকরে জলি করে করে সারা রাত্রি কাটিয়ে দিতেন। এ প্রসঙ্গে মরহুম মওলানা রুহুল আমিন সাহেব লিখেছেন :— হযরত পীর সাহেব বলিয়াছেন : "আমি অনেক সময় রাত্রে হুগলী বোর্ডিং হইতে বাহির হইয়া জেকর করিতে করিতে সমস্ত গলিকুচা ভ্রমণ করিতাম। সেই সময় একটি নূর আমার মস্তক হইতে পা পর্যন্ত বেষ্টন করিয়া লইত এবং উহার মধ্যে আমার আত্মবিস্মৃতি ঘটিত। অনেক সময় আমার 'জজবা'[২] হইত।"[৩]

হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) এর পীর ছিলেন হযরত মওলানা শাহসূফী সৈয়দ ফতেহ আলী(রঃ)। তাঁর কাছে বয়েত হয়েই তিনি কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া ও মোহাম্মদিয়া তরিকাগুলোতে সম্পূর্ণরূপে সুশিক্ষিত হয়ে ওঠেন ও তাঁর খেলাফত লাভ করেন। হযরত মওলানা শাহসূফী ফতেহ আলী সাহেব চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। হযরত আলী (রঃ)-এর পীর ছিলেন হযরত শাহসূফী মাশায়েখ সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)। হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ (রঃ) সাহেব হযরত মুজাদ্দিদ সৈয়দ আহমদ বেরেলবি (রঃ) এর কাছে বয়াত হয়েছিলেন। কাজেই অনেক ঐতিহাসিকের মন্তব্য, ফুরফুরার পীর মওলানা আবুবকর সাহেব 'সৈয়দ আহমদ বেরেলবির (রঃ) প্রশিষ্য' একথা মিথ্যা নয়।

হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ আঃ) ও হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর কাছে বাতেনী বায়েত লাভও করেছিলেন। হযরত মওলানা রুহুল আমিন লিখেছেন : "হযরত পীর সাহেব বলিয়াছেন : 'স্বপ্নযোগে হযরত আলী (রাঃ) আমাকে তওবা

২. জজবা :—ঊর্ধ্ব জগতের দিকে মনের আকর্ষণ।
৩. হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী : মওলানা রুহুল আমিন

করাইয়াছিলেন। আরও আমি স্বপ্নযোগে দেখিয়াছিলাম যে, একটি জঙ্গলে একটি গোলাকার পরিচ্ছন্ন স্থান আছে, তথায় হযরত ফাতেমা (রাঃ আঃ) বসিয়া আছেন, তিনি আমাকে বলিলেন, "বাবা, তুমি তওবা কর, সেই সময় তওবার ফয়েজ আমার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল।"[৪] মওলানা রুহল আমিন মরহুম হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর ছোহবতে থেকেছেন বহু বছর ; তাঁর সঙ্গে থেকে থেকে বাংলা আসামের বহু জায়গায় সফর করেছেন ও তাঁর 'হযরত পীর সাহেবের' নির্দেশে ওয়াজ-নসিহতও করেছেন। সে জন্য হযরত পীর আবুবকর (রঃ)-এর সম্পর্কিত মওলানা রুহল আমিন সাহেবের মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। মওলানা রুহল আমিন সাহেব আরও লিখেছেন : একদিবস হযরত পীর সাহেব স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে হযরত নবী (সাঃ) অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, আর তিনি তাঁহার পশ্চাতে চলিতে চলিতে নানাবিধ মছলা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে ফেকাহের খনি বানাইয়াছিলেন। বড় বড় আলেমগণ তাঁহার নিকট মছলা জিজ্ঞাসা করিতেন, আর তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া ও কিতাব না দেখিয়া জওয়াব দিতেন।"[৪] এমনি ছিল তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা। এমনতরো শিক্ষালাভের পর তিনি বোজর্গানে দীনের গোর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানে গমন করেন। অবশ্য একাধিকবার তিনি বাংলা-পাক-ভারতের বিশিষ্ট গউস কুতুব, ওলি দরবেশদের মাজার জিয়ারত করেছেন। প্রথমে তিনি পাঞ্জাবের 'সরহিন্দ' শরীফের হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (রঃ), হযরত মা'সুমে রাব্বানী (রঃ), সুলতানুল হিন্দ হযরত মঈন উদ্দীন চিশতি (রঃ), হযরত খাজা বাকি বিল্লাহ (রঃ), হযরত কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকি (রঃ), হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (রঃ), হযরত খসরু (রঃ), হযরত নাসিরুদ্দীন চোগরা (রঃ) ও আজমীর শরীফের তারাগড় পাহাড়ের শহীদগণের মাজার জিয়ারত করেন। তাঁর ধারণা ছিল জীবিত পীরদের দ্বারা যেরূপ রুহানী ফয়েজ লাভ হয়, মৃত পীরদের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক রুহানী ফয়েজ লাভ হয়ে থাকে। এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি পানিপথের হযরত তোর্ক সাহেবের মাজার, শাহ বু-আলী কলন্দরের মাজার, হযরত কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথীর মাজার জিয়ারত করে রুহানী ফয়েজ লাভ করেছিলেন।

৪. হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী : মওলানা রুহুল আমিন

তারপর তিনি বাংলা আসামের প্রতি জেলায়ই ইলমে শরিয়ত ও ইলমে তরিকতের প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা-আসামের হাজার হাজার লোক তাঁর সান্নিধ্যে এসে শরীয়ত ও তরিকতের তালিম গ্রহণ করে। প্রত্যেক ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর শত সহস্র লোক্‌কে তিনি 'আল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌!' জিকিরও 'মোরাকেবা' শিক্ষাদান করতেন। তাছাড়া লোকদের তিনি জরুরী মছলা-মাসায়েল, তাক্‌ওয়া, পরহেজগারী, পোশাক-লেবাস, চালচলন ও প্রথতেলাকি বিষয়গুলো সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে করতেন। বাজে পীরদের মহফিলে যে সব বেদআতী কার্যের অনুষ্ঠান হতো—যেমন অতি উচ্চৈঃস্বরে ও নর্তন-কুর্দন করে জিকির করা, হাতে হাতে তালি দিয়ে নানারূপ ভাব-ভঙ্গি করা, মাথা ঝাঁকিয়ে রাগরাগিণীসহ গজল গাওয়া, পীরের পায়ে বা গোরে য়েয়ে সিজদা করা প্রভৃতি হারাম ও নাজায়েজ কাজের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় এসব বেদআতী কাজ একেবারে নির্মুল হয়ে যায়। লাখলাখ লোক তাঁর কাছে মুরীদ হয়ে ইসলামের সুমহান শিক্ষা, আদব ও আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বহু শত লোক তাঁর খিলাফত লাভ করে লোকদের শরীয়ত ও তরীকত সম্পর্কে অবহিত করতে থাকেন। এমনিভাবে হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর কর্ম ও ধর্মজীবন শুরু হয়। পাপাচারে লিপ্ত, অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পথহারা দিক্‌ভ্রান্ত মানুষকে সত্যের পথে, সুন্দরের পথে, মুক্তির পথে, শরীয়ত ও তরীকতের পথে ডেকে নিয়ে আসার সাধনা শুরু করেন তিনি। বাল্যজীবন ও শিক্ষাজীবনেই তাঁর ভাবী কর্মজীবনের সুচনা পরিলক্ষিত হয়।

ফুরফুরা শরীফের ইতিকথা ও হযরত পীর সাহেবের বংশ পরিচয়

হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর পূর্বপুরুষ মওলানা মনসুর বাগ্‌দাদী (রঃ) তদীয় সেনাপতি হযরত শাহ হোসেন বোখারী (রঃ) কে সঙ্গে নিয়ে যখন বাংলাদেশে আগমন করেন, তখন আজিকার ফুরফুরা শরীফ ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো 'বালিয়া বাসন্তী' নামে অভিহিত হতো এবং এ অঞ্চলটি একজন হিন্দু বাগ্‌দী রাজার অধীন ছিল। "বালিয়া বাসন্তী' বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। বালিয়া বাসন্তীর মালিক এই হিন্দু বাগদী রাজা যে স্থানে বসবাস করতেন, সে স্থানটি 'বাগ্‌দী রাজার গড়' বলে সুপরিচিত ছিল। বর্তমানে তা 'চার শহীদের গড়' বলে প্রসিদ্ধ।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বাংলার ছোট ছোট ভূস্বামীদের দমন করার উদ্দেশ্যে এবং 'ভাগীরথী'র তীরবর্তী এলাকাসমূহ হস্তগত করার জন্য ৭৯৬ সনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কিছু সংখ্যক 'ওলি'ও প্রেরিত হয়েছিলেন, তন্মধ্যে হযরত শাহ সূফী সুলতানও (রঃ) ছিলেন। হযরত সূফী সুলতান এই সৈন্যদলকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন এবং একদল নিয়ে তিনি পাণ্ডুয়া অভিমুখে যাত্রা করেন এবং অপর দলকে হযরত শাহ হোসেন বোখারী (রঃ)-র নেতৃত্বে 'বালিয়া বাসন্তীর' দিকে প্রেরণ করেন। হযরত মওলানা মনসুর বাগ্‌দাদীর সঙ্গে যে চারজন 'ওলি' এসেছিলেন—তাঁরা ছিলেন সহোদর ভাই; এদের নাম (১) হযরত শাহ সৈয়দ খয়রের রহমান, (২) হযরত শাহ সৈয়দ তবিবুর রহমান, (৩) হযরত শাহ সৈয়দ আবিদুর রহমান, (৪) হযরত শাহ সৈয়দ ফয়জুর রহমান (রঃ), মতান্তরে (১) সৈয়দ মুহাম্মদ শাহ, (২) সৈয়দ মুহাম্মদ শরীফ, (৩) সৈয়দ মুহাম্মদ ফরিদ, (৪) শেখ্‌খারওয়া (রঃ)। বাগ্‌দী

রাজা এই মুসলিম সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হয়ে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের দিকে পলায়ন করেন। পলায়নপর রাজার পশ্চাদ্ধাবন করতে যেয়ে উপযুক্ত চারজন ওলি কাগমারি মাঠের যুদ্ধে শহীদ হন। সেনাপতি হযরত শাহ হোসেন বোখারী এই সংবাদ শুনে এঁদের মৃতদেহ 'বালিয়া বাসন্তী'তে নিয়ে আসেন এবং তথায় এদের দাফন করেন। আর এঁদের মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বলে কাগমারি মাঠেই সেগুলো সমাহিত করা হয়।

শামসুল ওলামা গোলাম সাল্‌মানির মতে 'বালিয়া বাসন্তী' এলাকা দখল করে মুসলমানগণ পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করেছিলেন বলে এর নাম দেয়া হয় 'ফার্‌রে ফারাহ্‌' অর্থাৎ পরিপূর্ণ আকস্মিক আনন্দ। আবার কারো মতে ঃ মুসলমানগণ এই এলাকা অতি দ্রুত অধিকার করে নিতে পেরেছিলেন বলে এর নামকরণ করা হয় (ফর্‌ফরাহ্‌)। এই (ফর্‌ফরাহ্‌) শব্দই পরবর্তীকালে 'ফুরফুরা'য় রূপান্তরিত হয়েছে। ফুরফুরায় বহু শরীফ আরেদ, সূফী, ওলি, গউছ, কুতব, আবদাল মওলানা মৌলবীর মাজার রয়েছে বলে বর্তমানে একে 'ফুরফুরা শরীফ' বলা হয়।

এই ফুরফুরার মরহুম হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রাঃ) মুসলিম জগতের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ)র বংশধর হেতু সিদ্দিকী উপাধিতে বিভূষিত হয়েছেন। তার পিতা হাজি মৌলবী মখদুম মোস্তাদের (রঃ)ও একজন বিশিষ্ট 'ওলি' ছিলেন। নিম্নে তাঁদের শেজরা বা বংশতালিকা প্রদত্ত হলো।

আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ)

তাঁর ওয়ালেদ ঃ মখ্‌দুম আবদুল মোস্তাদের (রঃ)
" " মখদুম মু'তাসিম বিল্লাহ "
" " মখদুম মওলানা গোলাম সামদানি "
" " মখদুম মুহাম্মদ মোনাক্কা "
" " " অজিহ্‌ উদ্দীন মজতবা "
" " " কুত্‌বুল আকতাব "
" " " মোস্তফা মাদানী "
" " " মুহাম্মদ খেজের "
" " " " দাউদ "
" " " " ইসমাইল বাগদাদী "

তাঁর ওস্তাদ মখদুম মুহাম্মদ শাহ কালু মিঞা (রঃ)
,, ,, ,, ,, আশরাফ ,,
,, ,, ,, ,, গিয়াস্ উদ্দীন বাগ্দাদী ,,
,, ,, ,, মুহাম্মদ ,,
,, ,, ,, মুহাম্মদ মনসুর বাগদাদী ,,
,, ,, ,, ,, জিয়াউদ্দীন জাহেদ ,,
,, ,, ,, ,, রুস্তম খোরাসানী ,,
,, ,, ,, ,, নূর মুহাম্মদ ,,
,, ,, ,, ,, খাজা নাসির উদ্দীন ,,
,, ,, ,, ,, শাহজাহান ,,
,, ,, ,, ,, খাজা মুহাম্মদ দীন ,,
,, ,, ,, মুহাম্মদ শাহ জাহেদ ,,
,, ,, ,, ,, শাহ আরিফ বিল্লাহ ,,
,, ,, ,, ,, শাহ আস্গার ,,
,, ,, ,, শেখ মুহাম্মদ আমজাদ ,,
,, ,, ,, শেখ আহমদ মুহাদ্দিছ ,,
,, ,, ,, খাজা আবদুর রহিম ,,
,, ,, ,, খাজা হযরত আবদুর রহমান ,,
,, ,, ,, কাসিম ,,
,, ,, ,, মুহাম্মদ ,,
আমিরুল মুমেনিন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)

হযরত নবী করিম (সাঃ) এর প্রথম খলিফা।"[১] ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের উর্ধ্বতন পুরুষদের দু' চার জনের বৈশিষ্ট্যের কথা প্রসঙ্গে মরহুম ডকটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব লিখেছেন : "তাঁহার (আমিরুল মুমেনিন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ১৬শ অধস্তন পুরুষ হযরত মনসুর বাগদাদী (রঃ) ৭৪১ হিজরীতে ভারতসম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে বাগদাদ শরীফ হইতে ইস্লাম প্রচারের জন্য বাংলা দেশে আসিয়া হুগলী জেলার অন্তর্গত 'মোল্লাপাড়া' গ্রামে বাস করেন। তাহার অধস্তন ৮ম পুরুষ হযরত মৌলানা হাজী মুস্তফা মাদানী হযরত মুজাদ্দিদ আলফি সানীর (রঃ) তৃতীয় সাহেবজাদা হযরত মা'সুম

১, হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী: মরহুম মওলানা রুহুল আমিন (রঃ)

রব্বানীর (রঃ) নিকট দিল্লীর জামে মসজিদে বায়আত হন। ঐ সঙ্গে বাদ্‌শাহ আওরঙ্গজেব ও তাঁর কাছে বায়আত হন। হযরত মা'সুম রব্বানী (রঃ) কর্তৃক মৌলানা মুস্তফা মদনী (রঃ) কে লিখিত দুইখানি পত্র সরহিন্দ শরীফে সুরক্ষিত হস্তলিখিত মকতুবাতে মাসুমিয়ায় লিখিত আছে। মৌলভী আবদুল হালীম আরামবাগী প্রণীত ফুরফুরার আ'লা হযরত পীরসাহেব কেবলার জীবনীতে এই দুইখানি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। মৌলানা মুস্তফা মদনীকে (রঃ) সম্রাট আওরঙ্গজেব বর্তমান মেদিনীপুর শহরে একটি মসজিদ নির্মাণ করিবার জন্য বহু লাখেরাজ সম্পত্তি দান করেন। এই মৌলানা মদনী সাহেবের নাম হইতে মদনীপুর নাম হয়, পরে তাহার অপভ্রংশে মেদেনীপুর হইয়াছে। বাদশাহী সনদের তারিখ ১০৭৭ হিজরী। ইহা ফুরফুরা শরীফের কেবলাগাহ সাহেবের খান্দানে রক্ষিত আছে।"[২]

মওলানা রুহল আমিন সাহেব লিখেছেন : "উল্লিখিত পত্রদ্বয়ের দ্বারা হযরত মোস্তফা মাদানীর উচ্চ দরজার কথা বুঝা যায়।"

২. ইসলাম প্রসঙ্গ : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ)এর পীর হযরত শাহসূফী ফতেহ আলী (রঃ)এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

"যদি সে রূপের রাজা পা রাখে মোর আখির 'পরে
বিলিয়ে দিব দীন-দুনিয়া তাঁর চরণের ধূলির তরে।
তাঁর পীরিতি জ্বালায় নিতি পরাণ এমন বুকের মাঝে,
আগুন-পারা মোর হাহাকার দেয় গলায়ে পাষাণেরে।"

উপরের এ চারটি চরণ পরম সুন্দরের রূপে পাগল সূফী ফতেহ্ আলী (রঃ) এর একটি ফারসী দীওয়ানের কাব্যানুবাদ। অনুবাদ করেছেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সূফী ফতেহ্ আলী সাহেব শুধু তরীকতের পীর ছিলেন না, তিনি ফারসী ভাষার উচ্চ শ্রেণীর একজন মরমী কবিও ছিলেন। তার দীওয়ান-ই-ওয়সীতে ১৭৯টি গজল ও ২৩টি কসীদা রয়েছে। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের বাসিন্দা। মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপনান্তে প্রথমে তিনি অযোধ্যার পদচ্যুত নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও পরে তার পলিটিক্যাল পেনশন অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হন। এ দায়িত্ব সুসম্পাদনের জন্য তখন তিনি কলকাতায় অবস্থান করতেন। তিনি মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত পুনাশী গ্রামে বিবাহ করেন এবং কলকাতাতেই সপরিবারে বসবাস করেন। কর্মজীবনে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ছিলেন। চাকুরী জীবনেও তিনি তার পীর সাহেব কেবলা প্রদত্ত বিধি-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। হযরত সৈয়দ আহ্মদ বেরেলবি (রঃ)-এর খলিফা হযরত শাহ সূফী নুর মুহাম্মদ নিযামপুরী (রাঃ) ছিলেন তার পীর-দস্তগীর। চাকুরীজীবনেই তিনি ধীরে ধীরে তরীকতের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং এজন্যেই পরিশেষে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তরীকত প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে

তিনি তার পীরের নির্দেশ মোতাবেক লোকদেরকে বায়আত দান করতেন এবং ইসলাম ও তরীকতের খেদমতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

একজন কামেল বুজুর্গ পীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রকাশ্যে বায়আত লাভ করা জরুরী বিধায় ফুরফুরার হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) এই কুতুবোল ইরশাদ হযরত মাওলানা শাহ সূফী ফতেহ আলী সাহেবের কাছে যেয়ে বায়আত হন। তাঁর কাছেই তিনি কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া ও মোহাম্মদীয়া-এই তরিকাগুলো শিক্ষা করে তাঁর খিলাফত লাভ করেন। হযরত সূফী ফতেহ আলী (রঃ) ছিলেন একজন উঁচু দরের কামেল ওলি। হযরত খিজির (আঃ) তাঁকে সাক্ষাত দান করে বলেছিলেনঃ "তুমি কিমিয়া চর্চা করছ কেন? তোমার জাতই[১] কিমিয়া।"

হযরত সূফী সাহেব তরীকত ও মা'রেফাতের জগতে আত্মিক শক্তিতে অত্যন্ত শক্তিমান ছিলেন। তিনি তাঁর মুরিদানকে মুহূর্তের মধ্যে হযরত নবী করিম (সাঃ)-এর জিয়ারত লাভ করিয়ে দিতে পারতেন। মওলানা রুহল আমিন সাহেব লিখেছেনঃ "হযরত সূফি সাহেব ফুরফুরার পীর সাহেবকে সমধিক কাশ্ফ শক্তিসম্পন্ন ধারণা করিতেন। এক দিবস তিনি ফুরফুরার হযরতকে বলিলেনঃ 'বাবা, তুমি আমার আছিলা দিয়া হযরত নবী (সাঃ)-এর জিয়ারতের নিয়তে বসিয়া থাক এবং তাঁর সহিত জিয়ারত হইলে অমুক বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিও।' ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব হযরত নবী (সাঃ) জিয়ারত লাভ করিয়া সেই বিষয়টি উত্তর জানিয়া লইলেন।"[২]

হযরত সূফী ফতেহ আলী (রঃ)-এর রোগ-ব্যাধি সলব[৩] করার শক্তি ছিল প্রবল। তিনি আঙুল দিয়ে ইশারা করলে পীড়িত লোকেরা রোগমুক্ত হয়ে যেত। দু'একটি ঘটনা বলা যাক্। একবার তাঁর শাশুড়ী পায়ের বেদনায় অস্থির হয়ে পড়েন। বহু চিকিৎসার পরও বেদনার কোনরূপ উপশম হচ্ছে না দেখে হযরত সূফী সাহেব তাঁর পায়ের বেদনাস্থান ধ'রে বললেন, "বেদনা তো নেই।" অমনি বেদনা দূর হয়ে গেল এবং তাঁর শাশুড়ী সুস্থ হয়ে উঠলেন। আর এক দিবস হযরত সূফী সাহেব পালকিতে কোথাও যাচ্ছিলেন। এই

১. জাতই—অস্তিত্ব
২. হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী : মওলানা রুহল আমিন।
৩. সলব :—ছিনিয়ে নেওয়া

অবস্থায় পালকির এক বেহারাকে সাপে কামড় দেয়। সাপের কামড়ে বেহারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। হযরত সূফী সাহেব বললেন, 'কোন ভয় নেই, তোমরা চলতে থাক।" তিনি কুওতের ফয়েজ দ্বারা বিষ আকর্ষণ করে নিয়ে মাটিতে দাফন করে দিলেন। বেহারা সুস্থ হয়ে উঠল। এই ধরণের অনেক ঘটনার নজির দেওয়া যায়।

হযরত সূফী ফতেহ্ আলী (রঃ) ছিলেন 'কুতবোল ইরশাদ'। ফুরফুরার হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিক (রঃ) স্বপ্নযোগে তাঁর এই দরজার কথা জানতে পেরেছিলেন। মওলানা রুহুল আমিন সাহেব লিখে গেছেন যে, হযরত সূফী সাহেব হযরত নবী করিম (সাঃ)-এর রুহ্ থেকে নিসবত হাসিল করেছিলেন। তাছাড়া চার তরিকার নিসবত তরিকা-সমূহের মূল চার হযরতের রুহ্ থেকেই হাসিল করেছিলেন। তাঁকে ওয়সিয়া তরিকার পীর বলেও অভিহিত করা হয়। প্রকাশ্যতঃ চার তরিকার ফয়েজ তাঁর পীর হযরত সূফী নূর মুহম্মদ নিয়ামপুরী কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের পীর ভাই হযরত মওলানা ইকরামুল হক সাহেব 'মুর্শিদাবাদী' বলে গেছেন ঃ "একদিন হযরত সূফী ফতহে আলী (রঃ) সাহেব ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবকে ডেকে বলেন ঃ 'বাবা আবুবকর, তুমি 'মোহ্ইয়োস্-সুন্নাহ' ও 'আমিরুশ-শরিয়ত' হবে।' আর আমাকে বলেন ঃ বাবা ইকরামুল হক, তুমি কচ্ছপের ন্যায় ধীর গতিতে পাহাড়-পর্বত হেদায়েত করবে।" মওলানা রুহুল আমিন (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত সূফী সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব কেবলা শরীয়ত ও সুন্নত যে ভাবে জারি করে গেছেন, তার তুলনা এ জামানায় নেই। আর মুর্শিদাবাদের হজুর রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, আসাম এমনকি সুদূর ভুটান পর্যন্ত যেভাবে হেদায়েত করে গেছেন তারও তুলনা নেই। এ জামানায় একেবারেই অতুলনীয়। তাঁদের উভয়েরই ত্যাগ ও কার্যক্রম।

সূফী ফতেহ্ আলী (রঃ)-র খলিফা ফুরফুরার হযরত পীর আবুবকর (রঃ) সাহেব নক্শবন্দীয়া, মোজাদ্দেদিয়া, চিশ্তিয়া ও কাদেরিয়া তরিকার প্রচার দ্বারা বাংলা-আসামের লাখ লাখ লোকের হৃদয় উদ্ভাসিত করেছেন, নূরানিত করে তুলেছেন। তাঁর কার্য দ্বারা তিনি উল্লিখিত তরিকালোকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন—যেগুলো আর বিলুপ্ত হবে না।

কারণ তিনি বাংলা-আসাম, এমনকি হিন্দুস্তান ও আরবদেশ পর্যন্ত এই তরিকাগুলোর প্রচার এমনভাবে করে গেছেন এবং এমন শত শত খলিফা রেখে গেছেন যারা রাত দিন প্রাণপণ চেষ্টা করে লোকদের তরিকার সবক দিয়ে যাচ্ছেন, লিখিতভাবে ও মৌখিকভাবে তরিকা-গুলোর মাহাত্ম্য প্রচার করছেন, হাতে-কলমে লোকদেরে তরিকায় সুশিক্ষিত করে তুলছেন। তাঁর নির্দেশক্রমে তাঁর জীবিতকালেই তাঁর সুযোগ্য খলিফাগণ তরিকতের বহু কিতাব লিখেছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশ-ক্রমে হযরত মওলানা রুহুল আমিন সাহেব 'তরিকত দর্পণ' বা 'তাসাওফ তত্ত্ব' লিখেছেন। হযরত পীর সাহেব এ কিতাবখানা তিনবার দেখে শুনে ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁর সুযোগ্য খলিফা হযরত মওলানা নেসার উদ্দীন সাহেব 'তালিমে মারেফাত' নামক কিতাব লিখেছেন। হযরত পীর সাহেবের অন্যতম বিশিষ্ট খলিফা সূফী সদরউদ্দীন (রঃ) লিখেছেন 'ইল্‌মে তাসাওফ' নামক তিন খণ্ড কিতাব। এ দরবারের বিশিষ্ট খলিফা হযরত মওলানা আবদুল খালেক এম, এ, (রঃ) লিখেছেন 'সিরাজুস্ সালেকীন' নামক একটি মূল্যবান তরিকতের কিতাব। এছাড়া আরও বহু তরিকতের কিতাব এই সিল্‌সিলার পীর ও খলিফাগণ লিখেছেন এবং লিখছেনও। হযরত পীর আবুবকর সাহেবের অন্যতম খলিফা হযরত মওলানা ফয়েজুর রহমান সাহেবের 'ইরশাদে মোর্শিদ' নামক কিতাবখানাও এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গদেশ, আসাম ও হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানে কাদেরিয়া ও চিশ্‌তিয়া তরিকার বহুসংখ্যক পীরও সালেক হয়তো রয়েছেন কিন্তু সূফী ফতেহ আলী (রঃ)-এর সিল্‌সিলা ছাড়া কোথাও নক্‌শবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকার পীর ও সালেক তেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় পরিলক্ষিত হয় না। কারণ এই তরীকাদ্বয়ে অগ্রগতি বিশুদ্ধ অর্থাৎ হারামবর্জিত খাঁটি হালাল বস্তু পান ও আহার এবং সুন্নতের পূর্ণ পায়রবির উপর নির্ভর করে। আর বর্তমান জমানায় সুন্নত ও হালাল মালের পরিপূর্ণ পাবন্দ পীর ও সালেক দুর্লভ বলেই এই তরিকাদ্বয়ের বিশেষ অনুসরণকারী দল সূফী ফতেহ আলী (রঃ) সাহেবের সিলসিলা ছাড়া অন্য কোন সিল্‌সিলায় পাওয়া যায় না।

সূফী ফতেহ আলী (রঃ) মুর্শিদাবাদের পুনাশী গ্রামে অবস্থান বা বসবাস করতেন। তাঁর এক ছেলে (মৌলবী মুক্তফা আলী) সেখানে

ইন্তিকাল করেন। তাঁর মেয়ে জোহরা খাতুন মুর্শিদাবাদ জেলার শাহপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। জোহরা খাতুন একজন বড় 'ওলি' ছিলেন হযরত সূফী সাহেব তাকে বাংলার 'রাবিয়া বসরি' বলে অভিহিত করে ছিলেন। হযরত জোহরা খাতুনও কাশ্‌ফসম্পন্ন আহ্‌লোল্লাহ্‌ ছিলেন। তার দৃষ্টিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ও প্রবল ছিল। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক।

একদিন হযরত সূফী সাহেব ও তার কন্যা জোহরা খাতুন পৃথক পালকিতে কোন এক স্থানে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় পালকি দুটো নামান হলো। হযরত জোহ্‌রা খাতুনের পালকী হযরত সূফী সাহেবের পালকি থেকে একটু দূরে নামান হয়েছিলো। হযরত জোহরা খাতুন পালকীতে থাপ্পা দিয়ে হযরত সূফী সাহেবকে ডেকে বল্‌লেন: আব্বা, এ জায়গায় গাঁজার দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমি সহ্য করতে পারছিনা, এ জায়গা থেকে পালকী সরাতে বলুন। সূফী সাহেব সেখান থেকে পালকি সরানোর জন্য নির্দেশ দিয়ে বিষয়টি তদন্ত করতে শুরু করলেন। স্থানীয় লোকেরা বল্‌লো: বহুকাল পূর্বে এখানে এক গাঁজাখোর বসবাস করতো। যারা আল্লাহ্‌ওয়ালা, যাঁরা খাটি 'ওলি' তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি এমনই প্রবল হয়ে থাকে। এঘটনা থেকে হযরত জোহরা খাতুনের উচ্চ দরজার পরিচয় মেলে। হযরত জোহরা খাতুনও হযরত সূফী সাহেবের অন্যতম খলিফা ছিলেন।

এই হযরত সূফী ফতেহ্‌ আলী (রঃ) বাং ১২৯৩ সনের ২০শে অগ্রহায়ণ ইন্তিকাল করেন। তার ইন্তিকাল-বৃত্তান্ত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষায় এখানে উদ্ধৃত করছি। ডক্টর শহীদুল্লাহ লিখেছেন: হযরত দাদাপীর সাহেব কেবলা যেদিন ইন্তিকাল ফরমান, তাহার পূর্বরাত্রে জনাব পীর সাহেব কেবলা (হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী) সমভিব্যাহারে হুগলী জিলার মোল্লা সিমলা গ্রামে জনৈক মোল্লার বাড়ীতে দাওয়াত উপলক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় দাদাপীর সাহেব কেবলা বলিয়াছিলেন যে 'তান্‌ফিরের ফয়েজ'[৪] আসিতেছে। তৎপর পীর সাহেব কেবলাকে হুকুম করিয়াছিলেন: হযরত শাহ হালক্কীর (রঃ) মাজার শরীফ জিয়ারত করিতে যাও। উক্ত হযরতের তরফ হইতে যাহা মা'লুম হয় আমাকে জানাইও। হজুর কেবলা বলিয়াছিলেন: "উক্ত

৪. তানফিরের ফয়েজ: দুনিয়া থেকে রুখসত হওয়ার ইঙ্গিত।

মাজার শরীফে বসিয়া আমার মালুম হইয়াছিল যে কাল মোল্লার বাড়ীতে আমাদের খাওয়া হইবে না, কিন্তু সাহস করিয়া এই কথা পীর সাহেবের কর্ণগোচর করিতে পারিলাম না। সেই রাত্রে দাদাপীর সাহেব কেবলা মোরাকাবায় বসিয়া সকলকেই সবক জিজ্ঞাসা করিলেন বটে, কিন্তু কাহাকেও তাওয়াজ্জুহ প্রদান করিলেন না, কেবল মাত্র হুজুর কেবলাকে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই তাওয়াজ্জুহ্ই হুজুরের শেষ তাওয়াজ্জুহ্। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দাদাপীর সাহেব কেবলা বলিলেন : 'একটি ফয়েজ বন্ধ হইয়া গেল কেন ?" পরক্ষণেই আবার তাঁহার চেহারা মোবারক উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিল। তিনি আবার বলিলেন, না ফয়েজ পুনরায় আসিয়াছে।' দুপুর বেলায় দস্তরখানে খাওয়ার সামগ্রী প্রস্তুত, এমন সময় তিনি ইস্তেঞ্জা করিয়া আসিয়া বলিলেন : 'আস্মান হইতে ব্যারাম আমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, জল্দি সলব কর।" হুজুর কেবলা সল্ব করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সলব হইতেছিল না। হুজুর বলিয়াছেন যে-'তখন আমার 'কুওয়াতের ফয়েজের" জোর ও খুব বেশী ছিল, এত চেষ্টা করিতে লাগিলাম যেন আমি শূন্যে উঠিয়া যাইতেছি, তথাপি ব্যারাম সল্ব হইতেছে না।' তৎপর তিনি ইশারায় জোহরের নামাজ আদায় করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার অর্ধেক শরীর অবশ হইয়া গেল। হুজুর কেবলা তাঁহাকে লইয়া গাড়ীতে করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সেদিন মোল্লা-বাড়ীতে তাঁহাদের আর খাওয়া হইল না। গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে যেমন পৌঁছিল, অমনি দাদাপীর সাহেব কেবলা হুজুর কেবলার কোলে মাথা রাখিয়া বেলা চার ঘটিকার সময় ইন্তিকাল ফরমাইলেন। ইন্নালিল্লাহে ...রাজেউন।"৬

হযরত সুফী সাহেবের মাজার শরীফ কলকাতা মানিক তলায় ২৪/১ মুন্সী পাড়া লেন, দিল্লীওয়ালা কবরস্থানে বিদ্যমান রয়েছে। —প্রতি বছর ২৬শে রমজান দিবাগত রাত্রে সেখানে ঈসালে ছওয়াবের জলসা হয়।

---

৫. কুওয়াতের ফয়েজ : মহাশক্তি। আধিক্য।
৬. ইসলাম প্রসঙ্গ : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

তবলীগ ও তনযীম[1]

হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) বিভাগ-পূর্ব বাংলা আসামের বড় বড় শহরে ও মফস্বলের হাজার হাজার জায়গায় প্রায় ৫০।৬০ বছর ধরে ইসলামের প্রচার ও মুসলিম সমাজের মধ্যে শৃখলা আনয়নের জন্য ওয়াজ নসিহত করে বেড়িয়েছেন। তাঁর সভায় লাখ লাখ লোকের সমাবেশ হতো। মওলানা রুহুল আমিন সাহেব লিখেছেন :—

"আমি পূর্ববঙ্গে প্রথমে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের সভাতে তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলাম ; তথায় অনুমান লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। চাঁদপুর, হাজিগঞ্জ, কেরওয়ার চর, রূপসা, নারায়ণহাট, নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ফেনী, বেদরপাশী, কালনা, ঝাপালি, সন্দিপুর, গদাইপুর, জালগাঁও, রাধানগর, চৌধুরানী, বিক্রট, বসিরহাট, সাতক্ষীরা, শর্ষিনা-মাগুরা, বরিশাল, পিরোজপুর, বাগেরহাট, চন্দ্রগঞ্জ, হরপানী, চৌমুহনী, আবুরহাট, চট্টগ্রাম, সুফিয়া মাদ্রাসা, মীর আহমেদপুর, রামপুর শ্রীনদী, চরশাহী, কুনিয়ানগর, লক্ষীপুর, দায়েরা, কল্যানদী অমদীয়া, কাজিরহাট, ধামতী, ভাসানিয়ারচর, আক্কেলপুর, বগুড়া, মেন্তাপীর, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা, মাঠের বাজার প্রভৃতি স্থানে ২০ হইতে ৭০ কিংবা ৮০ হাজার লোকের জামায়াত দেখিয়াছি। দশ-বিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ ক্রোশ দূর হইতেও লোক পতঙ্গের ন্যায় তাঁহার মোবারক চেহারা দর্শনের জন্য ছুটিয়া আসিত। অতি অল্প সময়ের সংবাদে এত বেশী লোকের সমাগম হইত যে আমাদের কর্ণ ইতিপূর্বে তা আর শ্রবণ করে নাই। ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, গুণী, মানী, আমীর, নবাব, মন্ত্রী, মওলানা-মৌলবী, মুন্সী-মাষ্টার, পণ্ডিত-সকলেই তাঁহার দর্শন ও দোয়ার প্রত্যাশী ; সহস্র সহস্র হিন্দু-মুসলমান তাঁহার নিকট হইতে তেল পানি-পড়া লইতে মতোয়ারা। তিনি ছোট্ট বড় সকলের সহিত সমান

---

১. তনযীম : শৃংখলা দান, বাঁদিকা গ্রহণ।

ভাবে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং নূরানী চেহারা দেখিয়া দূরদূরান্ত হইতে আগমনের কষ্ট সকলে ভুলিয়া যাইত। তাঁহার কণ্ঠস্বর এমন মধুমাখা এবং গম্ভীর ছিল যে তাহা নিকটে ও দূরে সমানভাবে শ্রুত হইত। তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী সকল ভক্তের হৃদয়পটে আঁকিয়া যাইত। অন্যান্য আলেমের দশ-বিশ ঘন্টা ব্যাপী ওয়াজ-নসিহত লোকের উপর যত না আছর করিত, তাঁহার দশ-পাঁচ মিনিট বক্তৃতাতে সেইরূপ আছর হইত। অন্যান্য আলেমগণ যুগব্যাপী সাধ্য-সাধনা করিয়া যত না হেদায়েত করিতে পারিতেন, তাঁহার এক সভাতে কতক্ষণের ওয়াজ-নসিহতে তদপেক্ষা অধিক হেদায়াত হইত। তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত মধুর উপদেশে কত মোশ্‌রিক বেদআতী শির্‌ক্ বেদ্‌আত্ পরিত্যাগ করিয়াছে; কতলক্ষ বে-নামাজী, বে-রোজাদার নামাজ রোজা শুরু করিয়াছে, কত অনৈস্‌লামিক পোশাকধারী ইসলামী পোশাক পরিধান করিতে শিখিয়াছে, কত গরপরহেজগার পরহেজগারে পরিণত হইয়াছে, কত বিড়ি সিগারেট তামাকখোর বিড়ি সিগারেট তামাক ছাড়িয়াছে, কত সুদখোর, ঘুষখোর, পণখোর, হারামখোর ঘুষ, সুদ, পণ ও হারামখুরি ত্যাগ করিয়াছে, কত শহর বন্দর ও পল্লীতে মাদ্রাসা মক্তব ও শিক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা সম্ভব নহে। প্রত্যেক সভায় ১০।২০।৪০।৫০ হাজার লোক তাঁহার নিকট মুরীদ হইয়াছে। সুতরাং কত লক্ষ লোক তাঁহার মুরীদ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব।

হযরত পীর সাহেব যখন শেষবারে বশিরহাটে যান, তখন লক্ষাধিক লোক তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বশিরহাটের রাস্তা পথ-ঘাট পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল, বিপুল আল্লাহু আকবর রবে গগন পবন প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই দৃশ্য না দেখিলে বুঝান কঠিন।

হযরত পীর সাহেব কখন ওয়াজের স্থলে কাহারও নিকট হইতে টাকা-কড়ি গ্রহণ করিতেন না, সভার সংগৃহীত চাঁদা গ্রহণ করিতেন না। যে ব্যক্তি দাওয়াত করিতে আসিত, যদি সে সুদখোর, ঘুষখোর, পণখোর, কট-বন্ধক গ্রহিতা কিংবা ফাসেক হইত, তবে তাহার দাওয়াত কবুল করিতেন না। যদি দৈবাৎ কোন হারামখোরের দাওয়াত অজ্ঞাতসারে কবুল করিতেন, তবে নিজের খরচে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিতেন, তাহার কিছুই খাইতেন না, লইতেন

না। তিনি অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল ব্যাপী ইসলাম প্রচারকালে কখন জাতসারে এইরূপ লোকের দাওয়াত স্বীকার করেন নাই, ইহা অপেক্ষা বড় কারামত আর কি হইতে পারে ?"[২]

মরহুম মওলানা রুহুল আমিন সাহেবের উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে আমরা হযরত পীর সাহেবের সভা-সমিতির, পরহেজগারী ও তাক্‌ওয়ার জলন্ত নজির দেখতে বা জানতে পারছি। এই পরহেজগারীর জন্যই তাঁর দরজা বড় উন্নত অর্থাৎ উন্নত দরজার অধিকারী ছিলেন তিনি। এখানে প্রয়োজনবোধে মরহুম মওলানা রুহুল আমিন (রঃ) এর বর্ণিত আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। তিনি লিখেছেন :—

"হযরত পীর সাহেব আমার চেষ্টাতে একবার খুলনা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে কয়েকটি সভায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে চাঁদখালির একটি সভায় তিনি ওয়াজ-নসিহত করেন। সভার অন্তে চাঁদখালির তালুকদার মোল্লা সাহেবেরা হযরত পীর সাহেবকে দুইশত টাকা নজর দেন ; কিন্তু তাহাদের সুদের কারবার ছিল, হজরত পীর সাহেব বলিলেন : 'বাবা, তোমরা সুদ হইতে তওবা কর। এই টাকাগুলি তোমাদের নিকট থাকুক, যদি তওবার উপর ঠিক থাকিতে পার, তবে একবৎসর অন্তে এই টাকাগুলি আমার মাদ্রাসায় পাঠাইয়া দিও।"[৩]

ফুরফুরার পীর সাহেবের ও তাঁর খলিফাগণের এইরূপ প্রচেষ্টায় হাজার হাজার লোক হারামখুরি ও জুলমবাজি ত্যাগ করে মানবতার খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে। সুদখোর ও ঘুষখোর জঘন্য রুচির মানুষ। এদের অত্যাচার অবিচারে সর্বসাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। আল্লাহ ও তাঁর রসুল সুদখোর-ঘুষখোরদের মোটেই পছন্দ করেন না। এদের হৃদয় মরে যায়,—হৃদয়ে কালিমা পড়ে। এদের সংস্পর্শে যারা যায় বা থাকে তাদেরও বড় ক্ষতি হয়। সুদখোর-ঘুষখোর লোকেরা আল্লাহ্‌র অভিশাপ কুড়িয়ে নেয়। মানুষের অভিশাপও এদের উপর থাকে। ভাল ও সৎলোকের পক্ষে এদের বাড়ীতে খানাপিনা করাও উচিত নয়। কারণ সুদের ও ঘুষের মাল, দ্রব্যসামগ্রী খেলে হৃদয়ে মরিচা পড়ে। এখানে একটি ঘটনার কথা বলছি। একজন মুরিদ হযরত পীর সাহেবের কাছে যেয়ে বলল : "হুজুর, আমার 'জিক্‌রে সুলতানোল আজকার' হাসিল

২. ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী : মওলানা রুহুল আমীন (রঃ)

হয়েছিল, শরীরের গোশ্‌ত ও চর্মের লোমকূপ থেকেও জিক্‌র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতো। কিন্তু একজন সুদখোরের বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়ার পর থেকে আমার সমস্ত দেহের ও লতিফাসমূহের জিক্‌র বন্ধ হয়ে গিয়েছে।" তার কথা শুনে হযরত পীরসাহেব তাকে খালেস তওবা করে তাঁর দিকে মোতাওয়াজ্জেহ্‌ হয়ে সমস্ত দেহের জিক্‌রের নিয়তে বস্‌তে বললেন। কিছুক্ষণ পরে আগের মত তার সমস্ত শরীরের জিক্‌র জারি হয়ে গেল। এরপর হযরত পীর সাহেব বললেন: দেহের প্রত্যেক মাংসের টুকরা আল্লাহ্‌ তাআলার জিক্‌র করতে থাকে। পক্ষান্তরে, হারাম খাদ্য উদরস্থ হলে এর দ্বারা যে রক্ত মাংস তৈরী হয়—এই হারাম রক্ত-মাংস দেহের জিক্‌রকারী রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ামাত্রই জিক্‌র বন্ধ হ'য়ে যায়।

হযরত পীর সাহেব তাঁর মুরীদানকেও হারাম মাল ও সন্দেহের মাল থেকে পৃথক থাকার জন্য জোর তাগিদ দিয়ে গেছেন। তাঁর মুরীদেরাও তাঁর কথা মেনে চলতেন। তাঁর খলিফাগণের অনেকেই কামেল বুজুর্গ ছিলেন। তাঁরা হারাম-হালাল তমিজ[৪] করে চলতেন। তাঁরাও কখনও হারামখোরের দাওয়াত কবুল করতেন না। মওলানা রুহুল আমিন মরহুম তাঁর বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের একটি ঘটনা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"আমি একবার রাজশাহী জেলার একজন লক্ষপতি লোকের দাওয়াত মৌলবী কোতবোররেজা সাহেবের অনুরোধে স্বীকার করি। স্টেশনে নামিয়া মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি: দাওয়াতকারী ব্যক্তি সুদ খায় না ত? তিনি বলিলেন: হাঁ, সুদ খায়। তখন আমি তাঁহার বাটীতে খাইতে অস্বীকার করি। মৌলবী সাহেব বলেন: আচ্ছা, আপনি তাহার বাটীতে ওয়াজ করিবেন, আমি স্কুলে চাকুরি করিয়া থাকি, আমার বাটীতে আপনি খাইবেন। অগত্যা আমি তাহাই স্বীকার করি। প্রভাতে দাওয়াতকারী নিজের মৃত পিতার গোর জিয়ারত করিতে আমাকে অনুরোধ করিলে আমি জিয়ারত সমাপন করি। অতঃপর তিনি আমাকে জিয়ারতের জন্য দুই হাতে অনুমান পঞ্চাশ টাকা নজর দিতে চেষ্টা করেন। আমি উহা লইতে অস্বীকার করিয়া বলি: যখন আমি আপনার বাটীতে খাইলাম না, তখন কি আপনি আশা করিতে পারেন যে, আমি আপনার টাকা-কড়ি লইব? আমি

৪. তমিজ: বিবেচনা, বিভিন্নতা, প্রভেদ।

স্বচক্ষে দেখিলাম যে সেই লক্ষপতি লোকটির অশ্রুবর্ষণ হইতেছিল। শুনিতে পাইলাম: তিনি সুদ ঘুষ সমস্ত এই বলিয়া ত্যাগ করেন যে, আমি দেশের রাজা, লক্ষাধিক নগদ টাকা আমার নিকট জমা থাকিতে একজন গণ্যমান্য আলেম আমার বাটীতে খাইতে পারিলেন না। তিনি খাঁটি পরহেজগার হইয়া ইন্তিকাল করিয়াছেন। তাহার পুত্র দীর্ঘকাল হইতে হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছেন যে, আমি তাহার দাওয়াত স্বীকার করি, কিন্তু এখনও আমার অদৃষ্টে তথায় যাওয়ার সুযোগ ঘটে নাই।"[৫]

এই যে হালাল-হারামের তমিজ তা প্রাচীন যুগের ওলি-দরবেশদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হত। তাঁরা হালাল ও পবিত্র রুজির দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতেন। হযরত শাহজালাল তবরেজি (রঃ) একটি গাভীর দুধ সাত দিবস অন্তর পান করে জীবন ধারণ করতেন। এই গাভীটিকে বনে জঙ্গলের ঘাস খাওয়াতেন। বাংলার সেন রাজা তাঁকে বাইশ হাজার টাকার সম্পত্তি দান করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। পরিশেষে রাজার বিশেষ অনুরোধে তিনি সামান্য কিছু মূল্য দিয়ে তা ক্রয় করে নিয়েছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন: 'ভবিষ্যতে হারামে পতিত হওয়ার ভয়ে আমি হালালের দশ ভাগের নয় ভাগ ছেড়ে দিয়েছি।'[৬] হযরত বশর হাফী (রঃ) কখনও বাদশাহ্ কর্তৃক খনন করা সরকারী পুকুরের পানি পান করতেন না। কারণ বাদশাহ্‌রা অনেক সময় প্রজাদের কাছ থেকে অত্যাচার পূর্বক ট্যাক্স ও খাজনা আদায় করে থাকেন। হযরত জুনুন মিসরি (রঃ) কে এক সময় জালেমগণ বন্দী করে কারাগারে আটক রেখেছিল। তিনি কয়েকদিন কারাগারে অনাহারে থাকেন। তাঁর মুরীদদের মধ্য থেকে এক সাধ্বী নারী তাঁর নিজহস্তে কাটা সুতার মূল্য দিয়ে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে তাঁর আহারের জন্য কারাগারে পাঠান। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। তখন স্ত্রীলোকটি কারাগারে যেয়ে হাযির হয়ে করজোড়ে অনুরোধ করে বলেন: "হুজুর, আমার অর্জিত হালাল খাদ্য আপনার জন্য পাঠিয়েছিলাম, আপনি তা গ্রহণ করেননি কেন?" তিনি উত্তরে বলেন: 'তোমার প্রেরিত খাদ্য হালাল। কিন্তু ঐ খাদ্য বাদশাহ্‌র পাত্রে এবং জেল দারোগার

---

৫. ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী: মওলানা রুহুল আমিন।

৬. কিমিয়ায়ে সায়াদাত (ব্যবহার খণ্ড): আবুল খায়ের মুহাম্মদ আয়ুব আলী।

হাতে আমার নিকট এসেছিল। জালেমের পাত্রে স্থাপিত ও জালেমের হস্তস্পৃষ্ট খাদ্য বলে তা আমি গ্রহণ করিনি।"[৭] হযরত বায়েজিদ বুস্তামি (রঃ) তাঁর মায়ের গর্ভে থাকাকালে তাঁর মা যদি কোন সন্দেহজনক জিনিসের দিকে হাত বাড়াতেন, তবে উক্ত বস্তু দূরে সরে যেতো, তাঁর হাত এই জিনিসের নিকট পৌঁছত না। এমনও বহু নজির কিতাবে পাওয়া যায় যে কোনো বুজুর্গ কামেল পীরের নিকট কোন সন্দেহজনক বস্তু নীত হলে, তা থেকে দুর্গন্ধ বের হতো, কোনো পীর ভুলক্রমে সন্দেহজনক বস্তু মুখে দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা বালুকণায় পরিণত হয়ে যেতো।[৮] ফুরফুরার হযরত পীর মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) এর পরহেজগারী ও তাক্ওয়া ছিলো সিদ্দীকগণের পরেহেজগারী ও তাক্ওয়ার মতো। সভা-সমিতিতে তিনি এমন ধরনের ওয়াজ-নসিহত করতেন যা ওলি দরবেশ সিদ্দীকগণ করতেন। তাঁর খলিফাগণও তাঁকে পুরোপুরি অনুকরণ ও অনুসরণ করতেন। বিভাগ-পূর্ব বাংলা-আসামের লাখ লাখ লোককে তিনি খাঁটি ঈমানদার, খাঁটি মুসলমান ও পবিত্রাত্মা আদর্শ মানুষের জীবনের অধিকারী করে তুলতে প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। অতীতের পীর, আউলিয়া, কামিল, গউস কুতুবদের মতো নিজের জীবনকে তিনি রাঙিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর জীবনে, তাঁর কার্যাবলীতে প্রাচীনযুগের সেই খাঁটি ওলি-দরবেশ, নবী ও সিদ্দীকগণের পরহেজগারী ও তাক্ওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। মরহুম মওলানা রুহুল আমিন (রঃ) এর দু'একটি বর্ণনা থেকে আরো দু'একটি নজির পেশ করছি। তিনি লিখেছেন :

(ক) "আমি যে সময় হযরত পীর সাহেবকে সাতক্ষীরায় লইয়া যাই, সে সময় বাঁকাল নামক গ্রামে মুরিদ করার জন্য তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। সেই গ্রামের একটি ঘুষখোর দুইটি ঘুষের টাকা তাঁহাকে দিয়াছিল। হযরত পীর সাহেব বলিলেন : বাবা, তোমার টাকা দুইটি বলিতেছে, ইহা ঘুষের টাকা। ইহা বলিয়া তিনি টাকা দুইটি তাহাকে ফেরত দিয়াছিলেন।"

(খ) "মওলানা ফয়জোর রহমান সাহেব বলিয়াছেন : হযরত পীর সাহেব নোয়াখালির মির আহমদপুরের জমিদার মোজাফ্ফর হোসেন ওরফে মুহাম্মদ মিয়া সাহেবের বাটীতে অবস্থানকালে একজন

---

৭. ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী : মওলানা রুহুল আমিন।
৮. কিমিয়ায়ে সায়াদত (ব্যবহার খণ্ড) : আবুল খায়ের মুহম্মদ আবদুল আজীজ।

সুদখোর তাঁহাকে একটি টাকা নজর দিয়াছিল। লোকটি পোশাকে মৌলবীতুল্য ছিল। হযরত পীর সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন: মিয়াঁ, তুমি কি সুদ খাইয়া থাক? সে ব্যক্তি মিথ্যা বলিল: আমি সুদ খাইয়া থাকি না। তথায় বহু লোক উপস্থিত ছিল। তাহারা এই লোকটির মিথ্যা কথা শুনিয়া অবাক হইতেছিল। কিন্তু অবশেষে হযরত পীর সাহেব টাকার দিকে কয়েকবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন: বাবা, তোমার টাকা তুমি লইয়া যাও। হযরতের এই কাশ্‌ফের[১] সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।"

(গ) "এক সময় কলিকাতা টিকাটুলি মস্‌জিদে নদীয়ার এক সুদখোর জমিদার পাঁচ টাকা হযরত পীর সাহেবকে নজর দেয়। তিনি উহা জেবে রাখিয়া অল্পক্ষণ চক্ষু বন্ধ করিয়া বলিলেন: তুমি সুদ খাইয়া থাক? অমনি সে ব্যক্তি হযরতের পায় হাত রাখিয়া বলিল: ইহার পরে যদি আমি সুদ খাই, তবে যেন আল্লাহ্‌র দীদার ও নবীর শাফায়াত হইতে বঞ্চিত হই। হযরত পীর সাহেব টাকাগুলি না লইয়া সুফী তাজাম্মোল হোসেন সাহেবের নিকট আমানত রাখিয়া বলিলেন: যদি এই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত সুদের তওবা কায়েম রাখে, তবে উহার বিহিত ব্যবস্থা করা হইবে।"

আবদুল ব্যাপারীর পুত্র বলিয়াছেন: আমি সেই জমিদারকে ধর্মতলার বড় মস্‌জিদে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম: হযরত পীর সাহেব যখন আপনাকে বলিলেন: তুমি কি সুদ খাও? তখন আপনি কেন তাঁহার পা ধরিয়াছিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন: যখন হযরত পীর সাহেব আমার দিকে নজর করিলেন, তখন আমি দেখিতে পাইলাম যেন একটা বিরাট অজগর আমাকে দংশন করিতে ধাবিত হইতেছে। এই হেতু ভয়ে তাঁহার পা ধরিয়া উক্ত কথা বলিয়া নিস্কৃতি লাভ করিলাম।"

বিভাগ-পূর্ব বাঙলা আসামের মুসলমানদেরকে অর্থাৎ মুসলিম সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করবার জন্য হযরত পীর সাহেব 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজিন' গঠন করেন। মুসলিম সমাজের স্তরে স্তরে খাঁটি ইস্‌লামের রীতিনীতি ও শরা-শরীয়তের সুশিক্ষা প্রদানের

---

১. কশফ: বেহেশতী প্রেরণা, আল্লাহ্ প্রকটিত সত্য।

সুব্যবস্থার জন্য তিনি বহু আলেমকে নিয়োজিত করেন। তিনি কিছুসংখ্যক আলেমকে বেতনভোগী প্রচারকরূপে নিয়োগ করেন। এঁদের বেতন দেবার জন্য বহু টাকা চাঁদার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি চাঁদা সংগ্রহেরও ব্যবস্থা করেন। বাঙলার পল্লীতে গিয়ে এই সব আলেম মুসলমানদের মধ্যে যে সব শিরক্ বেদআত ও কুসংস্কার রাশীকৃত হয়েছিল তা দূরীভূত করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। এইভাবে চলে মুসলিম সমাজে তবলীগ ও তান্‌যীমের কাজ। খাঁটি মুসল্লী, খাঁটি রোজাদার ও শরাশরীয়তের খাঁটি অনুসারী মুসলমানরূপে মুসলিম সমাজকে গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিয়ে বাঙলা-আসামের গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে এই সব বেতনভোগী আলেম মক্তব-মাদ্রাসা সংগঠন ও সংস্থাপন, হাফিজিয়া ফোরকানিয়া ও কেরাতিয়া মক্তব স্থাপন, সালিশী বিচারবোর্ড গঠন ও নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়াও 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজিনে'র কর্মিগণ শত শত অমুস্‌লিমকে মুস্‌লিম সম্প্রদায়ভুক্ত করার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু কোন অমুসলমানকে জোর করে মুসলমান করার যে কোন প্রচেষ্টার তাঁরা বিরোধিতা করেন। শুধু ইসলামের প্রতি অনুরক্ত অমুসলমানদেরই তাঁরা মুসলমান করার জন্য চেষ্টা করতেন। সামাজিক ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি বোর্ড বায়তুল মাল ফণ্ড সংগঠনে, হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর সেবাসংঘের আদর্শে যুব সংঘ প্রতিষ্ঠার কার্যেও তাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নিম্নোক্ত আলেমগণ 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজিনের' প্রচারকরূপে তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

মওলানা ফজলুর রহমান	কবুরহাট, পোড়াদহ।
মৌলবী হাবিবুর রহমান	ফরিদপুর।
মওলানা ইয়াদ আলী	মাতলা, চব্বিশ পরগণা।
মুন্সী ইবরাহীম	হাতিয়া, নদীয়া।
মৌলবী আবদুল আজীজ	হরিপুর, ঝিনাইদহ।
" " মজীদ	আটপাড়া, বগুড়া।
" " জব্বার	শশিপুর, চব্বিশ পরগণা।
মওলানা মকবুল হোসেন (আজলপুরী)	ভাণ্ডার পুর, রাজশাহী।
" ফজলুর রহমান (নিজামী)	চট্টগ্রাম।
হাজী মুন্সী জহীরউদ্দীন	ঝিনাইদহ, যশোর।
মওলানা আজিহউদ্দীন	মাহিগঞ্জ, রংপুর।
মৌলবী মোজাফফর হোসেন	কপুর হাট।

এঁরা সকলেই ছিলেন বেতনভোগী স্থায়ী প্রচারক। এছাড়া অনারারী অর্থাৎ বিনা বেতন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে সমস্ত আলেম 'আঞ্জুমানে-ওয়াজেজিনের' সদস্যরূপে বাঙলা-আসামে তবলীগের কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সে যুগে ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের এই উদ্যোগ, এই প্রচেষ্টা তাঁকে মুজাদ্দিদের মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছিল।

বিভাগ-পূর্ব বাংলা ও আসামে ইসলামী তান্‌যীমের কাজে তিনি নিজেই তাঁর শত সহস্র খলিফা নিয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শুধু ওয়াজ-নসিহত ও মৌখিক প্রচারেই তাঁরা তাঁদের কর্তব্যকার্য সমাপ্ত করেননি। অসংখ্য বই পুস্তক ও ইসলামী কিতাব রচনা করে, শত শত প্রচার পুস্তিকা ছাপিয়ে, বহু সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে তাঁরা বাংলা ও আসামে শরীয়ত ও তরিকতের বুনিয়াদ মজবুত করে তুলেছিলেন। হযরত পীর সাহেব তাঁর স্নেহভাজন খলিফা মওলানা রুহুল আমিন সাহেবকে মুসলিম সমাজের তান্‌যীমি খেদমতের জন্য কিতাবাদি লিখতে নির্দেশ দেন। মওলানা রুহুল আমিন হযরত পীর সাহেবের নির্দেশ লাভ করে কিতাবাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রায় প্রতিটি কিতাবই লিখে হযরত পীর সাহেবকে পাঠ করে শোনান ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর সেগুলো পীর সাহেবের অনুমোদন নিয়ে প্রকাশ করেন। মুসলিম সমাজ যেসব গায়ের ইসলামী রীতিনীতি ও কার্যকলাপ প্রচলিত ছিল সেগুলো সমূলে উৎপাটিত করতঃ খাঁটি ইসলামী মুসলিম সমাজ গড়ে তোলাই এইসব কিতাব লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল। অধিকন্তু, যেসব এখতেলাফী বিষয় নিয়ে মুসলিম সমাজে নানা ধরনের কোন্দল ও কলহ বিদ্যমান ছিল—সেগুলোর সুমীমাংসাকল্পে ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মওলানা রুহুল আমিন পীর সাহেবের নির্দেশে বিস্তারিত আলোচনা করে কোন্দল, কলহ ও ঝগড়া ফ্যাসাদের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। এসম্পর্কিত বহু কিতাব তিনি ও তাঁর পীর ভাইদের কেউ কেউ লিখেছেন। শমিনায় হযরত মওলানা নেসার উদ্দীন (রঃ) ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন। তিনিও বহু কিতাব হযরত পীর সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক লিখে প্রকাশ করেছেন। ফুরফুরার পীর সাহেবের দরবার অবশ্য শাহী সুলতানাতের দরবার ছিল না, কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে এই দরবার ছিল বাংলা ও আসামের মুসলিমদের ধর্মীয় সুলতানাতের দীপ্ত দরবার। এখান থেকে

ইসলামরূপ সূর্যের যে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হতো তার দ্বারাই বাংলা ও আসামের ধর্মাকাশের বা ধর্ম রাজ্যের আঁধার বিদূরিত হত। এই দরবারের আলোকপ্রাপ্ত হয়ে হযরত মওলানা রুহুল আমিন ৭৬টি কিতাব লিখেছিলেন এবং হযরত মওলানা নেসার উদ্দীন লিখেছিলেন প্রায় ৫০টি কিতাব। তিনি তাঁর শত শত খলিফার মাধ্যমে বাংলা, আসাম, ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে তবলীগ ও তানযীমের কার্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। সংক্ষেপে নিম্নে তাঁর খলিফাদের একটা মোটামুটি হিসাব প্রদান করছি। তাঁর খলিফা ছিলেন হুগলীতে ৩৪ জন, নোয়াখালীতে ৫৯ জন, ত্রিপুরায় ১০ জন, চট্টগ্রামে ২০ জন, বরিশালে ১৫ জন, নদীয়ায় ২৩ জন, ফরিদপুরে ১২ জন, পাবনায় ৩৮ জন, যশোহরে ৫২ জন, খুলনায় ২০ জন, রংপুরে ১৩১ জন, মেদিনীপুরে ১১ জন, কলকাতায় ১১ জন, হাওড়ায় ৮ জন, ময়মনসিংহে ৬ জন, সিলেটে ৩ জন, পুর্ণিয়ায় ২ জন, মুর্শিদাবাদে ২ জন, বর্ধমানে ৩ জন, রাজশাহীতে ৭ জন, ঢাকায় ৩ জন, চব্বিশ পরগণায় ৩১ জন, মালদহে একজন। মালদহে যে খলিফা ছিলেন, তাঁর নাম মওলানা হেদায়েত উল্লাহ্ ; পেশোয়ারে তাঁর একজন খলিফা ছিলেন তাঁর নাম মওলানা আবদুল মজিদ, গয়াতে একজন ছিলেন নাম হাজী সুফী মীর মুহাম্মদ বাকুওয়া, এ ছাড়া দ্বারভাঙ্গায় ছিলেন মৌলবী শাহ আবদুল ওয়াহেদ, বদখশানে ছিলেন মওলানা বদখশানী নামে খ্যাত, মক্কায় ছিলেন মৌলবী মোয়াজ্জেম হোসেন মক্কী, মক্কা মেছফালাতে ছিলেন মওলানা বদর উদ্দীন, বোখারাতে ছিলেন মওলানা মোঃ ওমর বোখারী। তাঁরা পীর সাহেবের প্রতিনিধি হিসাবে আত্মদুর্গত, আত্মবিস্মৃত ও আত্মনিরত মানবতার খেদমত করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ লোক খাঁটি ইসলামী জীবন পথের সন্ধান লাভ করেছে, একতা, ঐক্য, সংহতি ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

কর্মজীবনের একটি বিশিষ্ট দিক

ফুরফুরার হযরত মওলানা শাহ সুফী হাজী আবুবকর সিদ্দিকী (র:) ছিলেন একজন কর্মনিষ্ঠ পুরুষ। দেশ ও জাতির জন্য তিনি যা করে গেছেন তার তুলনা নেই। শত অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল বাংলা ও আসামের লক্ষ লক্ষ মুসলমান। নানারূপ পাপাচারে লিপ্ত, দিকভ্রান্ত, অশিক্ষিত পথহারা এই মুসলমানদের দুরবস্থা দেখে তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠেছিল। এদের ইসলামী শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে তুলবার জন্য তিনি তাঁর আলেম মুরীদদের দেশের সর্বত্র ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশ লাভ করে তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় বহু ইসলামী বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার মানে কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করেন। আর তিনি নিজেও বহু মক্তব, মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা, এতিম-খানা ও কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়কার বাংলা ও আসামের প্রায় সব ক'টি ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করেছেন তিনি। প্রথম পর্যায়ে মৌলবী আবু নছর অহিদ কর্তৃক ও দ্বিতীয় পর্যায়ে মোমিন কমিটি কর্তৃক তৎকালীন ওল্ড স্কীম মাদ্রাসাগুলোর ধ্বংস সাধনের ষড়যন্ত্র তিনিই বানচাল করেন। এঁদের ষড়যন্ত্রের কথা টের পেয়েই তিনি ঘোর প্রতিবাদ ও আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর প্রতিবাদ ও আন্দোলনে ষড়যন্ত্রকারীদল কোণঠাসা হয়ে পড়েন এবং পরিশেষে তাঁদের প্ল্যান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। হযরত পীর সাহেব জোর দিয়ে বলেছিলেন: মুসলমানদের দ্বীন ইসলাম, শরাশরীয়ত, ধর্মকর্ম যা কিছু আছে তা শুধু এই ওল্ডস্কীম মাদ্রাসাগুলোর কল্যাণেই রয়েছে। এগুলোর ধ্বংস মানে দ্বীন ইসলামের ধ্বংস।"

খ্রীস্টান, ওয়াহাবী, বেদা'তী ও কাদিয়ানী সম্প্রদায় যখন বাংলা-পাক-ভারতের 'সুন্নত অল্ জামায়ত'কে আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছিল, তখন ফুরফুরার পীর সাহেব এদের আক্রমণ থেকে তাঁর লাখ লাখ আলেম মুরীদান নিয়ে 'সুন্নত অল্ জামায়াত'কে রক্ষা করেন। তাঁর দরবারে

হাজার হাজার মওলানা, মৌলবী, ওলি-দরবেশ হাজির থেকে ইসলামী শিক্ষায় নব জীবন লাভ করেন ও জেহাদী মনোভাব নিয়ে বেদআতি ফেরকা-গুলোর বিরুদ্ধাচরণ করেন। তারা খ্রীস্টান মিশনারীদের অপপ্রচার থেকে দলগুলোর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন।

হযরত পীর আবুবকর (রঃ) তাঁর বাড়ীতে ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আলমদের জন্য হাদীস পাঠের সুব্যবস্থা করে রেখে গেছেন। তাতে টাইটেল কোর্স পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। তিনি লোকদেরে 'তাসাউওফ' বা আল্লাহ্‌কে পাবার তত্ত্বশিক্ষা দেবার জন্য পৃথক দায়রাখানা বা খানকাহ্ শরীফ নির্মাণ করে গেছেন।

বাংলা, আসাম, আরব, পারস্য তুরস্ক, কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি স্থান থেকে বহু তরীকত পথান্বেষী তাঁর কাছে এসে কাদেরিয়া, চিশ্‌তিয়া, নকশবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া তরীকার পাঠ গ্রহণান্তে দেশে ফিরে যেত। অধিকন্তু বিদেশী ছাত্রেরা মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা পাস করার পর এল্‌মে তাসাউফ শিক্ষা লাভ করতে দেশে যেত।

তিনি তাঁর বাড়ীতে ১৫০ হাত দীর্ঘ পাকা গৃহবিশিষ্ট নিউ স্কীম হাই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে আটাশ হাজার টাকার সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে দিয়ে গেছেন। ছাত্র ও শিক্ষকদের থাকা ও খাওয়ার সুবিধার জন্য মাদ্রাসা সংলগ্ন সুবৃহৎ বোর্ডিংও রয়েছে। এ ছাড়া সেখানে তিনি এক বিরাট কুতব-খানাও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বহু দুর্লভ আরবী, ফারসী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী কিতাব এ কুতবখানায় সংরক্ষিত আছে। তফ্‌সির হাদীস ফেকাহ ও ইতিহাস সংক্রান্ত অসংখ্য কিতাব এখানে আছে। তাঁর বাটীস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়টির বর্তমানে ঘটেছে যথেষ্ট উন্নতি।

হযরত পীর আবুবকর (রঃ)-এর দরাজহস্ত ছিল। তিনি গোপনে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান খয়রাত করে গেছেন। তাঁর কাছ থেকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য নিয়ে 'মোস্‌লেম-হিতৈষী', ইসলাম দর্শন, হানাফী, 'শরীয়ত', 'সুন্নত অল্ জামাত,' 'হেদায়েত' ও 'মোসলেম' প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলো পরিচালিত হতো।

এ ছাড়াও বাংলা ও আসামের ওলামাদের সুনিয়ন্ত্রিত ও সংঘবদ্ধ করার জন্য তিনি 'জমিয়তে ওলামা' শীর্ষক দল গঠন করেন। এই দল আলেম সমাজের মধ্যে একতা স্থাপন, ফেত্‌না-ফ্যাসাদ বিদূরণ, দেশ ও সমাজের

খেলাফতকরণ প্রভৃতি কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিল ও মুসলমানদের জীবনে ইসলামী রাজনীতিজ্ঞান বা চেতনা সঞ্চার করেছিল। আজীবন তিনি এই জমিয়তে ওলামার স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কল্যাণ সাধনও 'জমিয়তে উলামা' 'সংগঠনের অন্যতম মূল কারণ ছিল। কলিকাতার জমিয়তে উলামার অধিবেশন ত্রিপুরা, চাঁদপুর, নোয়াখালি, চৌমুহনি, হাজিগঞ্জ ও ফরফুরা শরীফে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বারেই লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছে। হাজিগঞ্জের অধিবেশনে দিল্লীর মওলানা আহমদ সাঈদ ও চৌমুহনির অধিবেশনে মওলানা হোসেন আহমদ মদনী (রঃ) যোগদান করেছিলেন।

পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) ১৩৩০ সালে দ্বিতীয়বার পবিত্র হজব্রত করেন। এই সময় পথিমধ্যে বোম্বাইয়ে তিনি চব্বিশ দিন অবস্থান করেছিলেন। মুসাফিরখানায় হজযাত্রীদের স্থান সংকুলান হতো না। তাই তাঁরা নানা জায়গায় পড়ে থাকতেন। অনেক সময়ই দস্যু-তস্করেরাও খাদেমরূপ হজযাত্রীদের সঙ্গে এসে মিলিত হতো। পরে সুযোগ বুঝে গাঁট কেটে টাকা-কড়ি নিয়ে চম্পট দিত। কখনও বা পানি কিংবা শরবতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাঁদের পান করতে দিত। এই বিষপান করে বহু হাজী মৃত্যুবরণ করত, আর খাদেমরূপী এই তস্করেরা তাঁদের সর্বস্ব লুটে নিত। তা ছাড়া দীর্ঘদিন বোম্বাইয়ে অবস্থান করতে হতো বলে যাত্রীদের দুর্ভোগের সীমা-পরিসীমা থাকত না। তিন চারগুণ বেশী মূল্য দিয়ে তাঁদের খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য জরুরী জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হতো। কাবুলি, লেশোয়ারী, বোখারী ও হিন্দুস্তানীরা জাহাজের ভাল স্থানগুলো নির্দিষ্ট সময়ের আগে থেকেই দখল করে বসে থাকত। বাঙালী হাজীরা তাদের ধারে কাছে যাওয়ার সাহস পেত না। নিরুপায় হয়ে তারা জাহাজের কদর্য জায়গায় পড়ে থাকত এবং কাঠ ও পানি নেওয়ার সময় কথিত লোকদের দ্বারা অত্যাচারিত হতো।

পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) বাঙালী হাজীদের এই অসুবিধা ও নির্যাতন দেখে হজ থাকাকালে এসম্পর্কে সংবাদপত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে পাঠান। হজ থেকে ফিরে এসে তিনি এনিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু করেন। বাঙালার গবর্ণরের কাছে বার বার টেলিগ্রাম করে গবর্ণরকে এই পরিস্থিতির কথা জানান। এই অসুবিধা ও অন্যায়ের অবসানকল্পে 'জমিয়তে উলামা' থেকে প্রস্তাব পাস করিয়ে নিয়ে তিনি গবর্ণরের কাছে

পাঠান। পীর সাহেবের পক্ষীয় লোকদেরকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডাকে পাঠান হলে তাঁরা সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করেন। তারপর কলকাতা থেকেই হজযাত্রীদের যাতায়াতের জন্য জাহাজ মঞ্জুর করা হয় এবং তাদের অসুবিধা দূর করার জন্য হজ্ব কমিটি গঠন করা হয়। এরই ফলে বাঙালী হজযাত্রীদের দুর্ভোগ অনেকটা দূর হয়।

সে-সময় সারদা আইন পাশ হলে দেশময় তুমুল আন্দোলন ঘটে ওঠে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ছেলের বয়স আঠার এবং মেয়ের বয়স চৌদ্দ পূর্ণ না হ'লে বিবাহ নিষিদ্ধ করে এক আইন পাশ করা হয়। এই আইন কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী বলে হযরত পীর সাহেব 'জমিয়তুল উলামা' থেকে প্রতিবাদমূলক প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করেন। তারপর কলকাতা গড়ের মাঠে মনুমেন্টের নীচে এক বিরাট জনসভায় হযরত পীর সাহের এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন- "মহারাণী ভিক্টোরিয়া কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু এই সারদা বিলে এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এক্ষণে আমাদের উপর দু'টি কর্তব্য অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়েছে। হয় আমাদের সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে, না হয় হিজরত করতে হবে। কোরআন শরীফ আমাদের সামনে, হাদীস শরীফ ডাইনে আর ব্রিটিশ আইন বামে। যদি ব্রিটিশ আইন কুরআন-হাদীসের বিরোধী না হয়, তবে আমরা তা সমর্থন করতে বাধ্য, আর যদি তা কুরআন-হাদীসের বিরোধী হয়, তবে রাজদ্রোহিতামূলক অপরাধে অপরাধী হলেও আমরা তার প্রতিবাদ করে যাব।"

১৩৪০ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদে বঙ্গীয় ওয়াক্‌ফ বিল পাশ হয়। সরকার ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় থেকে কিয়দংশ নিয়ে ওয়াক্‌ফ বোর্ডের কর্মচারীদের বেতন দেবার ব্যবস্থা করেন এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয়ের উপর রোড-সেস্ নির্ধারণ করেন। কিন্তু তা শরীয়তসম্মত নয় বলে হযরত পীর সাহেব এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেন। ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উপর যে সব শর্ত নির্দেশ করে দেয়, ঠিক সেই শর্তানুসারে এর আয়-ব্যয় করতে হবে। এর ব্যতিক্রম শরীয়তের খেলাপ। হযরত পীর সাহেব 'জমিয়তে উলামার' মাধ্যমে এর প্রতিবাদলিপি রচনা করে এবং একখানা ফতোয়া লিখে দিয়ে তা কেন্দ্রীয় পরিষদে পেশ করার জন্য স্যার আবদুল হালিম গজনবীকে

নির্দেশ দান করেন। তাঁর প্রতিবাদের জন্যই 'সারদা আইন' ও 'ওয়াক্‌ফ বিল্' কার্যকরী হতে পারেনি।

লা-মজহাবী, কাদিয়ানী ও বেদআতী ফেরকাসমূহের ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্যের জন্য হজরত পীর সাহেব মওলানা রুহুল আমিন সাহেবকে নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশে মওলানা রুহুল আমিন সাহেব 'সুন্নত অল্ জামায়াত' পত্রিকা মারফত ও বহু কিতাব লিখে এদের মতবাদ খণ্ডন করেন।

হযরত পীর সাহেব নিজেও বাঙলা আসামের প্রায় সর্বত্র সভাসমিতি করে পথহারা দিকভ্রান্ত মুসলমানদের সহজ সরল সত্যপথের সন্ধান দিয়ে যান। সভা-সমিতিতে যে দিকে যার মুখের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ত, তিনিই কেঁদে উঠ্‌তেন ও চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দিতেন। সভা-সমিতিতে যখন তিনি কলেমা তৈয়ব পাঠ করতেন তখনই সভাস্থ সকল লোকই চোখের পানি ফেলতেন। তাঁর মানবতাবোধও ছিল প্রবল। এখানে একটি ছোটখাট ঘটনার উল্লেখ করছি।

সাতক্ষীরার একটি মেথর মেয়ে মুসলমান হয়ে দশপারা কুরআন শরীফ মুখস্থ করে নিয়েছিল। তসির উদ্দীন নামক সেখানকার এক নামজাদা সরদার এই হাফেজা মেথর মেয়েটিকে বিয়ে করেন। এতে সাতক্ষীরার মুস্‌লিম সমাজ সরদারকে একঘরে করে। জন-মজুর, ঘরামি, সামাজিক আদান-প্রদান প্রভৃতি বন্ধ করে দেয়। তখন মাওলানা সানাউল্লাহ্ সাহেব সেখানে যেয়ে লোকদের এসম্পর্কে বোঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু লোকেরা তাঁর উপদেশ-নির্দেশাদি উপেক্ষা করে ঐ সিদ্ধান্ত বজায় রাখে। সামাজিক বয়কটের ফলে বেচারা তসিরউদ্দীন সরদার খুবই অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পরিশেষে নিরুপায় হ'য়ে তসিরউদ্দীন সরদার তাঁর হাফেজা মেথর স্ত্রীকে নিয়ে ফুরফুরা শরীফে যেয়ে হাজির হন এবং পীর সাহেবের কাছে তাঁর সমস্ত দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করেন। হযরত পীর সাহেব তাঁর এই নিদারুণ দুঃখের কাহিনী শুনে মর্মাহত হন এবং তিনি সাতক্ষীরার লোকদের জাহিলিয়াতের কথা ভেবে দুঃখ প্রকাশ করেন। কতক্ষণ পর পীর সাহেব কেবলা সর্দার তসির উদ্দীনের হাফেজা মেথর স্ত্রীকে অন্দর মহলে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে ভেতর বাটীতে যেয়ে তার বড় বিবিকে বললেন দুটি বাসনে ভাত তরকারি রেখে একটিতে ঐ মেথর মেয়েটিকে খেতে দিতে এবং অপরটি বাহির

বাড়ীতে তসিরউদ্দীন সর্দারের জন্য পাঠিয়ে দিতে। তারপর তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন: আপনি যদি আপনার দাদা হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর শাফায়াত চান, তবে এই মেয়েটির ঝুটা ভাত তরকারি খাবেন। আমি বাহির বাড়িতে তসিরউদ্দীনের ঝুটা ভাত তরকারি খাব। খোদা যদি এই আবু বক্করের কোন বন্দেগী কবুল না করেন, তবে আশা করি অন্তত একাজের জন্য বেহেশতে দাখিল হতে পারব ও রসূলে খোদার শাফায়াত লাভে সক্ষম হব। তাঁর হুকুম তাঁর বড় বিবি সানন্দে তামিল করলেন। সাতক্ষীরার লোকেরা একথা শুনে তসির উদ্দীন সরদারকে একঘরে করা থেকে বিরত হয়। এ ভাবে তিনি বহু সহস্র পতিত মানুষকে সামাজিক মর্যাদা পেতে সাহায্য করেন।

এক সময়ে 'তুরা' পাহাড়ের আশি হাজার গারো কুকি ইত্যাদি পাহাড়ী জাতি মুসলমান হতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাংলা ও আসামের অন্য মুসলমান এদের নিজেদের সমাজে খাওয়া দাওয়া ও নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে রাজী হয়নি বলে ওরা পরে খ্রীস্টান হয়ে যায়। হযরত পীর সাহেব তা দেখে শুনে লোকদের বলতে লাগলেন: ধর্মের বিধান অনুসারে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং নিম্ন শ্রেণীর মুচি, মেথর, শূদ্র, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতীয় মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার পর এক হয়ে যায়। ইসলামের কোনো ভেদাভেদ নেই। সকলেই সমান সামাজিক মর্যাদার অধিকারী।

রংপুরেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। একটি বাজনাদার ছেলে খাঁটি মুসলমান হয়ে ইসলামী শরা-শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু স্থানীয় মুসলিম সমাজে তাকে কোনরূপ সামাজিক মর্যাদা দিতে রাজী হয়নি। এমন কি, মসজিদে এক সঙ্গে তাকে নামাজ পড়তে দিতেও রাজী হয় না। হযরত পীর সাহেব তা শুনেই মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীসহ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁরা সেখানকার লোকদের বহু রকম করে বুঝানোর পর তাকে সমাজে সমান মর্যাদা দিতে রাজী হয় ও এক মসজিদে নামাজ পড়তে একই মজলিসে তাকে নিয়ে উঠাবসা ও খাওয়া-দাওয়া করতে রাজী হয়। কিন্তু দু'একটি পামণ্ড তখনো তাঁদের কথা মেনে নিতে রাজী ছিল না। সে যুগের মুসলিম সমাজের অবস্থা প্রমাণ মওলানা রুহুল আমিন সাহেব লিখেছেন:

"আমাদের বঙ্গ-আসামের কোন নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান হইলে মুসলমান সমাজ তাহাকে সমাজভুক্ত করিয়া লইতে রাজী হয় না.

এমন কি বাঙ্গিয়া, বাজানদার প্রভৃতি গোমরাহ মুসলমানগণ শরীয়তের পাবন্দী করিলে, তাহাদের সঙ্গে বিবাহ-শাদী করা ত দূরের কথা, এক মজলিসে খাইতে ও এক মছজিদে নামাজ পড়িতে দেওয়া হয় না। মওলানা আক্রাম খাঁ সাহেবের আপন ভাই খৃস্টান হইয়া পুনরায় মুসলমান হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহাকে আর সমাজে গ্রহণ করা হইল না।"[১]

হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) এই পাষাণপ্রাণ মুসলিম সমাজকে শরীয়তি এলেম দান ক'রে এবং তরীকতে দীক্ষা দিয়ে কোমল প্রাণ করে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান আদর্শ পরহেজগার পীর। তাঁর দরবার ছিল বাংলা পাক-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণীদের দরবার। সে শাহী নয় দ্বীনি দরবারের পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন: হযরত শাহসূফী সদরউদ্দীন (রঃ), হযরত মওলানা শাহসূফী নেছার উদ্দীন (রঃ), হযরত মওলানা রুহুল আমিন (রঃ), হযরত মওলানা শাহসূফী আবদুল খালেক এম-এ (রঃ), রংপুরের হযরত মওলানা শাহসূফী মফিজউদ্দীন (রঃ), কলকাতার মওলানা শাহসূফী আলী হামিদ জালালী (রঃ) নদীয়ার মওলানা শাহসূফী তাজাম্মেল হুসেন সিদ্দিকী (রঃ), মওলানা শাহসূফী নজমুল হক দোগাছি (রঃ), হুগলীর মওলানা শাহসূফী কাজী আবদুল মোহায়মেন সিদ্দকী (রঃ), মওলানা শাহসূফী হাতেম আহ্‌মদ শ্রীনদী (রঃ), মেদিনীপুরের হযরত মওলানা শাহসূফী আবদুল মা'বুদ (রঃ), হযরত মওলানা শাহসূফী শফিউদ্দীন (রঃ)।

হযরত পীর সাহেবের জীবনে কোনরূপ আড়ম্বর ছিল না। খাওয়া-দাওয়া ও পোশাক-পরিচ্ছদে যিনি ছিলেন অনাড়ম্বর। সাদাসিধা সুন্নতি খাওয়া-দাওয়া ও সুন্নতি লেবাস ছিল তাঁর ও তাঁর লাখ লাখ মুরীদানদের। পায়জামা, তহবন্দ, লম্বা কোর্তা, টুপি ও পাগড়ী তিনি ও তাঁর মুরীদানেরা ব্যবহার করতেন।

১, ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী: মওলানা রুহুল আমীন।

হযরত পীর সাহেবের তাকওয়া ও পরহেজগারী

আল্লাহ্‌র রসূল বলেছেন : "কোন লোক ততক্ষণ-পর্যন্ত পরহেজগারদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হওয়ার আশংকায় কতকগুলো নিঃসন্দেহ বিষয় ত্যাগ করে।"[1]

হযরত মওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রঃ) কামেল পীরের শর্তাবলীর মধ্যে দ্বিতীয় শর্তরূপে নির্ধারিত করেছেন পরহেজগারীকে। পীরের পক্ষে হারাম, শোবা ও সন্দেহের মাল থেকে দূরে থাকা জরুরী। হারাম বর্জন না করে কোনো লোক কখনো খাঁটি পীর হতে পারে না। আমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব যে দীনের রওনক বৃদ্ধি করেছেন পরহেজগার মুত্তাকী ও হালাল বস্তু ভক্ষণকারী লোকেরাই, আর দীনের ধ্বংস সাধন করেছে ঐ সব লোকেরাই যারা পরহেজগারী, তাকওয়া ছেড়ে দিয়ে হারাম বস্তু ভক্ষণে নিরত রয়েছে। হারামে পতিত হবার ভয়ে হযরত ওমর (রঃ) হালাল বস্তুরও দশভাগের নয়ভাগ পরিত্যাগ করেছিলেন। আর তিনি তা করতে পেরেছিলেন বলেই সারা জাহানে আদর্শ খলিফারূপে তাঁর খ্যাতি রয়েছে এবং ইসলামেরও রওনক ত্বরিৎ গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নিরিখে আমরা ফুরফুরার পীর হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর জীবনকে বিচার করে দেখতে পারি। তাঁর তাকওয়া ও পরহেজগারী আদর্শতুল্য কিনা যে কোনো লোক তাঁর জীবন-কাহিনী থেকে প্রমাণপঞ্জী নিয়ে দেখতে পারেন। এখানে আমরা তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা থেকে কিছুসংখ্যক তাকওয়ার নজির পেশ করছি। হযরত পীর সাহেব জীবনে কখনো সন্দেহজনক দ্রব্য গ্রহণ করেননি। সুদখোর, ঘুষখোর, সুরাবখোর, সরকারি উকিল ও মোক্তারদের টাকা-পয়সা নজররূপে গ্রহণ করেননি, তাদের দাওয়াত ও কবুল করেননি।

১, তিরমিযী : ইবনে মাজা।

কোন এক সময় এক দরজি তাঁকে দাওয়াত করতে আসে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনঃ 'বাবা, তুমি অন্যের কাটা কাপড় কি রেখে দাও?' তখন দরজি তার নিজের এই দোষ আছে বলে স্বীকার করে। পীর সাহেব তখন শুধু ওয়াজ-নসিহত করে চলে আসবেন, খাওয়া-দাওয়া কিছুই করবেন না এই শর্তে দাওয়াত রাখলেন।

হযরত মওলানা শাহ্ সূফী তাজাম্মুল হোসেন সিদ্দিকী বলেছেনঃ হযরত পীর সাহেব যশোর জেলার একজন ধনবান লোকের দাওয়াত রাখেন। দু'বেলা খাওয়ার পর তিনি তার সুদের সংশ্রব থাকা সম্পর্কে অবহিত হন। পীর সাহেব তাকে সুদ খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন। লোকটি তাঁর কাছে দোষ স্বীকার করে এবং তওবা ক'রে সুদের সংশ্রব ত্যাগের প্রতিশ্রুতি দেয়। পীর সাহেবের হাতে তখন কোন টাকা-পয়সা ছিল না। অগত্যা তিনি নিজের গায়ের জামাটা তার কাছে রেখে আসেন। দু'বেলা খোরাকীর মূল্য দু'টাকা সাব্যস্ত করা হয়, আর হুজুরের জামার মূল্য ছিল ছ'টাকা। পীর সাহেব বাড়ী ফিরে এসে মনিঅর্ডার করে দু'টি টাকা ঐ লোকের নামে পাঠিয়ে দেন। সে তিন মাস পরে একজন লোক মারফত হুজুরের জামাটি পাঠিয়ে দেয়।

যে লোক জমি বন্ধক রাখত, পীর সাহেব তার দাওয়াত রাখতেন না। যে ব্যক্তি সেভিংস ব্যাঙ্কে কিংবা অপর কোন অফিসে সুদের নিয়তে টাকা জমা রাখত, তিনি তারও দাওয়াত কবুল করতেন না। যে বিয়েতে পণ নেওয়া হতো, তাতেও তিনি যোগদান করতেন না। মরহুম মওলানা রুহুল আমিন একথা লিখে গেছেন।

হযরত পীর সাহেব ফাসেক কিংবা বেনামাজির দাওয়াত স্বীকার করতেন না। চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত মালের কিছুই আহার করতেন না এবং হাদিয়া কিংবা তোহ্ফারূপেও তা গ্রহণ করতেন না। কেউ তাঁকে পাথেয় পাঠালে তা থেকে যা উদ্বৃত্ত থাকত, তা পাথেয় প্রদানকারীকে ফেরত দিয়ে দিতেন। কেউ তোহ্ফা আনলে খুব তদন্ত করে তা নিতেন। তদন্তের পর সন্দেহ উপস্থিত হলে, তা আর গ্রহণ করতেন না, ফেরত দিয়ে দিতেন।[২]

মনিরাম পুর হাটের মওলানা ফজলুর রহমান লিখেছেনঃ এক সময় হযরত পীর সাহেব বজবজের দিকে অছিপুর গ্রামে দাওয়াতে গিয়েছিলেন।

২ সওয়ানেহে ওমরী

তখন তাঁর বাড়ী থেকে সংবাদ যায় যে, তাঁর বড় সাহেবজাদা হযরত মওলানা আবদুল হাই সাহেব নিউমোনিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন এবং মধ্যম সাহেবযাদা হযরত মওলানা আবু জা'ফর সাহেব মশারি সমেত পুড়ে গিয়েছেন।

নদী পার হতে না পারলে ট্রেন ধরবার কোন উপায় নেই। [illegible] সারেঙ বোট নিয়ে উপস্থিত হলো, পীর সাহেব বললেন: '[illegible] বোটখানা আপনাদের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু অন্যের ব্যবহারের জন্য তো অনুমতি দেয়নি। কাজেই তাতে আমি উঠতে পারি না। ছেলেদেরে আল্লাহ্ তাআলার হাতে সমপর্ণ করলাম।'

হযরত পীর সাহেব গোয়ালন্দের এক সভাতে গমন করেন। সেখানে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। সভার শেষে উদ্যোক্তারা সকলে মিলে চার হাজার টাকা পীর সাহেবের কাছে নজরানাস্বরূপ হাযির করে। পীর সাহেব এই টাকা থেকে একটি পয়সাও না নিয়ে বললেন: 'খোদা জানেন; এই টাকাতে কত রকম লোকের, কত ধরনের ব্যবসায়ীর টাকা মিশানো রয়েছে। এই টাকার প্রতি আমার মনে সন্দেহ জেগেছে। আপনারা সম্ভবতঃ আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও এই টাকা থেকে করেছেন।' এই ব'লে নিজের পকেট থেকে টাকা বের করে খাওয়ার খরচ হিসাব করে দিয়ে দেন।[৬]

নদীয়াক পুর হাটের মওলানা ফজলুর রহমান বলেছেন: একবার গোয়ালন্দে রেলওয়ে কোম্পানীর পাথুরে কয়লা দিয়ে হযরত পীর সাহেবের জন্য পাক করা হয়েছিল। পীর সাহেব তা জানতে পেরে বলেছিলেন: 'কোম্পানী তো অপর লোকের পাক করার জন্য কয়লা ব্যবহার করতে আদেশ দেয়নি।' এর পর বাজার থেকে পৃথকভাবে জ্বালানি কাঠ কিনে এনে তাঁর জন্য নূতন করে পাক করা হয়।

মওলানা রুহুল আমিন লিখেছেন: একবার চট্টগ্রামে মৌলবী আবদুল মজিদ হযরত পীর সাহেবকে তাঁর নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভোরবেলা ছাত্ররা বোর্ডিং থেকে পানি গরম করে ওজুর জন্য পীর সাহেব হুজুরের কাছে নিয়ে হাযির করে। হুজুর জিজ্ঞাসা করেন: এই পানি কোথায় গরম করা হয়েছে? ছেলেরা জবাব দেয়: বোর্ডিং এ

৬. হুজুরের জীবনী:

গরম করা হয়েছে। পীর সাহেব হুজুর বলেন : "কাঠের মালিক আমার এই পানি গরম করবার জন্য তো কাঠ দেননি।" এই বলে তিনি নিজের পকেট থেকে কাঠের মূল্য দিয়ে দেন।

একবার কলকাতা নিউমার্কেটের ১১নং মসজিদে মওলানা আবদুল মা'বুদ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মুন্সী আবদুল বারী হুজুরের পবিত্র হাতে বাইয়ত হন এবং কাদেরিয়া তরিকার তা'লিম নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। হযরত পীর সাহেব মওলানা আবদুল মা'বুদকে তরিকার অজিফা লিখে দিতে আদেশ করেন। হুজুরের নির্দেশে তিনি নিজ কামরায় যেয়ে এক চিল্‌তে কাগজে (বিছানার উপর কাগজ খণ্ডটি ছিল) অজিফা লিখে দিলেন। মুন্সী আবদুল বারী অজিফা লিখিত কাগজ খণ্ডটি পীর সাহেব হুজুরকে দেখালেন। পীরসাহেব হুজুর বল্‌লেন : 'ও মিয়া, আপনি এই কাগজের টুকরো কোথায় পেলেন ?" তিনি বল্‌লেন : 'বিছানা আবারকের উপর পেয়েছি।' পীরসাহেব হুজুর বললেন : 'পরের জিনিস ব্যবহার করা কি উচিত ? একটি ছেলে তাবিজ লেখার জন্যে এই কাগজ নিয়েছিল। যাও, তার কাছে যেয়ে মাফ চেয়ে নাও।' তিনি যথা-সময়ে নীচে নেমে এলেন এবং কাগজের মালিক ছেলেটির কাছে এজন্য মাপ চেয়ে নিলেন। অধিকন্তু দোয়াত-কলমেরও অনুমতি নিয়ে গেলেন। একটি ফতোয়াতে দস্তখত করার জন্য দোয়াত-কলম তলব করা হলে এই দোয়াত-কলম পীর সাহেবের সামনে তিনি হাযির করেন। পীর সাহেব জিজ্ঞাসা করেন : 'এই দোওয়াত-কলম কার ?' তিনি বললেন : অমুক ছাত্রের। আমি তাঁর কাছে থেকে অনুমতি নিয়েছি।' পীর সাহেব বললেন : "আমার ব্যবহারের জন্যও কি তাঁর ইজাযত নিয়েছ ?" তিনি বললেন : 'হুজুরের জন্য কিছু বলা হয়নি।' তখন হুজুর বললেন : "আপনার জন্য তা দিয়ে লেখা জায়েয হবে, আমার জন্য নয়।"

হযরত মওলানা আবদুল মা'বুদ সাহেব বলেছেন : একদিন হযরত পীর সাহেব আমাকে বলেছিলেন, "বাবা, দেখতো অমুক আয়াত কোন্ সুরাতে আছে ? আমি সেই কুরআন শরীফ খুলতে যাব।" অমনি হুজুর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'এই কুরআন শরীফখানি কার ? আমি বললাম : 'হাফেজ সাহেবের।' তিনি বললেন, 'যারই হোক, তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছ কি ? বাবা, প্রত্যেক লোকেরই এসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখা খুবই দরকার, তা না হলে কেউ-ই জীবনে তরক্কী করতে পারবে না।'

আমি বললাম, 'হুজুর, অন্যান্য পীরেরা ত এই সব ছোট খাট বিষয় নিয়ে ত বেশী মাথা ঘামান না। তখন হুজুর আল-কুরআনের আয়াত: 'ফা মাই ইয়া'মাল মিস্কালা জাররাতিন শাররাই ইয়ারাহ্' পাঠ করে বললেন: 'যদি এই আয়াতের অর্থ তাঁরা বুঝতেন তা' হলে তাঁরা এত নির্ভীক হতেন না। সাবধান এখন থেকে এসব বিষয়ে সতর্ক থাকবে।'

মরহুম হযরত মওলানা রুহুল আমিন সাহেব বলেছেন: হযরত পীর সাহেব কেবলার কোন এক মুরীদ পায়খানাতে গিয়ে পায়খানা থেকে ফিরে আসার সময় সেখানকার একটি নালাতে কয়েকটি মাছ দেখতে পেয়ে মাছগুলো ধরে বদনাটি পূর্ণ করে নিয়ে আসে পীর সাহেব কেবলার কাছে। হুজুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'মাছগুলো কোথেকে আনলে?' সে ব্যক্তি বলল: 'পায়খানার কাছে একটি নালা ছিল। পায়খানা থেকে ফেরার পথে ঐ নালায় এই মাছগুলো চরতে দেখে আমি ধরে নিয়ে এসেছি।' হুজুর বললেন: 'উক্ত নালা এবং যে পুকুর থেকে মাছগুলো বেরিয়েছে, তার মালিক কে, তুমি কি তা জান?' লোকটি বলল: 'না, হুজুর।' তখন পীর সাহেব হুজুর তাকে বললেন: 'তুমি আমার কাছে মুরীদ হয়েছ কত বছর হয়েছে?' লোকটি জবাব দিল, 'ন বছর।' হুজুর বললেন: "কিছু শিখেছ কি?' জবাবে সে বলল: 'কালবের সবক নিয়ে জিকরের অভ্যাস করছি, কিন্তু কোন কয়েজ বুঝতে পারছি না।' হুজুর বললেন: 'কাল্‌ব শুদ্ধির অন্তরায় হয়, এমন আচার-আচরণে বা রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত হলে কি কাল্‌ব জারি হতে পারে? যাও মাছগুলো যেখান থেকে এনেছ, সেখানে যেয়ে রেখে এসো। যদি মাছ মরে যায় তার জন্য ক্ষমা চেয়ে এস। ক্ষমা না করলে দাম দিয়ে এসো।'

বগুড়ার সুফী ছায়েম উদ্দীন সাহেব বলেছেন: "আমি এক সময় হযরত পীর সাহেব কেবলার সঙ্গে হুগলী জেলার কোন এক সফরে গিয়েছিলাম। প্রথমে তিনি একজন উকিলের বাড়ীতে যেয়ে বসলেন। উকিল সাহেব পীর সাহেব কেবলার জন্য একটি নারকেলের ডাব আনলেন। পীর সাহেব বললেন: "বাবা, যে জমিতে এই নারকেল গাছটি আছে, তা কেমন জমি?" উকিল সাহেব জানালেন: 'বন্ধকি সুদের টাকায় অবশ্য এই জমিটুকু কেনা হয়েছিল।" পীর সাহেব বললেন, "এমন জমির গাছের ডাব আমি খেতে পারব না।"

মরহুম মওলানা রুহুল আমিন লিখে গেছেন :

"হযরত পীর সাহেব কলিকতার কসাইদের জবেহ করা গো-গোশত খাইতেন না এবং মুরিদগণকে খাইতে নিষেধ করিতেন। কেননা জবহ-কারী কসাইরা যেরূপে জবেহ করিয়া থাকে উহাতে উহার ভিতরি শিরা কাটা পড়েনা, পরে অন্য লোক আসিয়া ভাল করিয়া শিরা কাটিয়া দিয়া যায়, কিন্তু বিছমিল্লাহ্ পড়ে না।

"তিনি (হযরত পীর সাহেব) অতি সাদা চিনি ব্যবহার করিতেন না। কেননা, কোন পুস্তকে লিখিত আছে যে, রক্ত দ্বারা উক্ত চিনি রিফাইন করা হইয়া থাকে। আর রক্ত হালাল ও হারাম সমস্ত প্রাণীর হইতে পারে। তিনি বাজারের ঘৃত ও মাখন ব্যবহার করিতেন না। উহাতে চর্বি মিশ্রিত থাকিতে পারে, চর্বি ভাল-মন্দ, হালাল-হারাম সকল প্রকার জন্তুর হইতে পারে।

"তিনি বাজারের দধি ব্যবহার করিতেন না। বাজারের বিস্কুট ও পাঁউরুটী ব্যবহার করিতেন না। মুরগী তিন দিবস বাঁধা না থাকিলে উহার গোশ্ত খাইতেন না। বাজারের মিল্টান্ন ব্যবহার করিতেন না।"[৪]

হযরত পীর সাহেবের এই তাক্ওয়া ও পরহেজগারীর সঙ্গে তুলনা করা যায় সেই অতীত যুগের সুফীয়ায়ে কেরামের ও সিদ্দীকগণের তাক-ওয়া ও পরহেজগারীর। সাহাবায়ে কেরামের 'তাক্ওয়া' ছিল হযরত পীর সাহেবের আদর্শ। হযরত ওহাব ইবনুল ওয়ারদ (রঃ) কোনো জিনিসের হাকিকত না জেনে তা কখনও খেতেন না। একবার তাঁর আম্মা তাঁকে এক পেয়ালা দুধ খেতে দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'আম্মা, এই দুধ কে দিল? এর দামই বা কিভাবে দিলেন? দুধ কার কাছ থেকে কিনলেন?' এইসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পাওয়ার পর আবার জিজ্ঞাসা করলেন : 'ঐ বক্রী কোথায় চরত?' এই প্রশ্নের জবাবে বুঝলেন বক্রীর চারণ ভূমিতে অপর মুসলমানের কিছুটা স্বত্ব রয়ে গেছে। তখন তিনি আর এই দুধ পান করলেন না।[৫]

৪. ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী : মওলানা রুহুল আমীন।
৫. কিমিয়ায়ে সাআদাত (ব্যবহার খণ্ড)

হযরত আলী ইবনুল মা'বাদ (রাঃ) বলেছেন : আমি একখানা ঘর ভাড়া করেছিলাম। একবার একটি চিঠি লিখে এর কালী আমার ঐ ভাড়া করা ঘরের দেয়ালের ধুলো দিয়ে শুকিয়ে নিতে ইচ্ছা করলাম। তখন হঠাৎ মনে হলো : এই ধুলোর মালিক তো আমি নই। সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাবলাম : এই সামান্য ধুলোর মূল্যই বা কি হতে পারে? কাজেই এই সামান্য ধুলো চিঠির লেখার উপর ছড়িয়ে দিলাম। রাত্রেই স্বপ্নে দেখি : কে যেনো আমাকে বলছেন : 'যে ব্যক্তি অপরের দেয়ালের ধুলোকে সামান্য, তুচ্ছ ও মূল্যহীন মনে করে, কাল কিয়ামতে সে বুঝতে পারবে।'[৬]

খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রাঃ)-এর সম্মুখে লোকে লুটের কস্তুরি এনেছিল। তিনি নাসিকা বন্ধ করে বললেন : 'এর গন্ধ লওয়াও এর দ্বারা উপকৃত হওয়া। উহা তো সাধারণ মুসলমানের প্রাপ্য।'[৭]

হযরত ওমর (রাঃ) লুটের কস্তুরি মুসলমানদের কাছে বিক্রয়ের জন্য তাঁর স্ত্রীর নিকট রাখেন। একদা তাঁর স্ত্রীর রুমালে কস্তুরির গন্ধ পেয়ে এর কারণ জানতে চাইলে তাঁর স্ত্রী বললেন—'বিক্রয়কালে যে সামান্য সুগন্ধি আমার হাতে লেগেছিল, তা এই রুমালে মুছেছিলুম।' অমনি হযরত ওমর স্ত্রীর মাথা থেকে সেই রুমালখানা খুলে নিয়ে পানি দিয়ে ধুতে লাগলেন। ধুতে ধুতে যখন কস্তুরির গন্ধের লেশমাত্রও রইল না, তখন তিনি রুমালটি তাঁর স্ত্রীকে ফেরত দিলেন। তিনি হারামে পতিত হবার ভয়ে এবং মুত্তাকী শ্রেণীভুক্ত থাকার আশায় এই হালাল সুগন্ধি বর্জন করেছিলেন।[৮]

হযরত আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) কে একজন লোক জিজ্ঞাসা করল : "ধর, কোন লোক মসজিদে আছে। এমন সময় বাদশাহ্‌র লোক এসে মসজিদে সুগন্ধির ধুম দিতে লাগল। লোকটির তখন কি করা উচিত?" তিনি জওয়াবে বললেন : 'ঐ ব্যক্তির তখন মসজিদ থেকে বের হয়ে আসা উচিত। কেননা, বাদশাহ্‌দের ন্যায়-অন্যায় লব্ধবস্তু বা সম্পদের ধুমও হারামের কাছাকাছি। যে পরিমাণ সুঘ্রাণ সে গ্রহণ করল ও

৬, কিমিয়ায়ে সাআদত : ইমাম গাজ্জালী (রঃ), (ব্যবহার খণ্ড)

৭, ,, ,, ,, ,,

লোকেরা বাগানে জন্মান, তা তার ভোগ করা হতো। এতে পরহেজগারী থাকে না।[১]

উপর্যুক্ত ঘটনাবলী থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ফুরফুরার হযরত পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর তাক্‌ওয়া ও পরহেজগারী ছিলো সাহাবা, সালেহ ও নেককার, মুত্তাকীন, সিদ্দীক ও ওলীদের পরহেজগারীর সমতুল্য।

---

১. কিমিয়ায়ে সাআদত : ইমাম গাজ্জালী (রঃ), (ব্যবহার খণ্ড)

কাশ্ফ ও কারামত

হযরত পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) ছিলেন একজন উচ্চ দরজার সূফী তাত্ত্বিক। এই সূফী তাত্ত্বিকদের সম্পর্কে হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) লিখেছেন ঃ 'সূফীরাই হচ্ছেন আল্লাহ্‌র পথে চালিত করার সঠিকতার পথপ্রদর্শক। সূফীদের মত সুন্দর জীবনের, প্রশংসনীয় চরিত্রের ও নৈতিক পবিত্রতাবোধের অধিকারী আর কেউ নেই। চিন্তাবিদদের সকল বুদ্ধি, দার্শনিকদের সকল জ্ঞান ও আইনজ্ঞদের সকল যুক্তি এক করলেও তা দিয়ে সূফীদের মতবাদ সংশোধন ও উন্নত করা যাবে না। সূফীদের কাছে স্থৈর্য ও গতি, অন্তর ও বাহির এসবই নবুয়তের আলোকাধারের জ্যোতিতে আলোকিত। সূফীদের আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ হচ্ছে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কিছু থেকে তাঁদের হৃদয়কে পবিত্র করা, আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমজ্জিত থাকা; আর সর্বশেষে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌তে মগ্ন হওয়া। 'শেষ ধাপের' অর্থ এখানে জীবনের সেই স্তর যেখানে ইচ্ছা ও শক্তি অর্জনের সাহায্যেই পৌঁছুতে হয়। সত্যিকথা বলতে গেলে, আবার এটাই হচ্ছে সাধনাময় জীবনের প্রথম ধাপ, প্রথম তোরণ—যেখান দিয়ে ভক্তের অনুপ্রবেশ। আর এপথে প্রবেশ করা মাত্রই নানা তথ্য তাঁদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে উঠে। জাগ্রত অবস্থায় তাঁরা ফেরেশ্‌তা ও নবীদের আত্মার দর্শন লাভ করেন। তাঁরা শুনতে পান তাঁদের বাণী ও নিত সদুপদেশ। বাণীর আকার ও প্রতীক নিয়ে সাধনার ফলে তাঁরা ধীরে ধীরে এমন এক স্তরে উপনীত হন, মানুষের ভাষা যার নাগাল পায় না।"[১]

সূফী তাত্ত্বিকেরা নবুয়তের দরজা লাভ করেন কিন্তু তাঁরা নবী নন। নবীদের অনুসরণ তাঁরা পুরোপুরিই করে থাকেন। নবীদের অনুসরণ করেই তাঁরা নবুয়তের জ্যোতিপ্রাপ্ত করেন। নবুয়ত হচ্ছে একটি বিশেষ অবস্থা। যে অবস্থায় হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর মতে এমন

১. [illegible] নাজির চৌধুরী ৭৮

অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় যাতে আল্লাহ্‌র আলোয় প্রতিভাত হয় মানুষের ধারণা ও বুদ্ধির অতীত বিষয়বস্তুসমূহ। তাই আল্লাহ্‌র ওলি এই সূফী-তাত্ত্বিকেরা নবুয়তের জ্যোতির সাহায্যে ভবিষ্যতের ঘটনা কিংবা দূরবর্তী স্থানের খবরাখবর অনেক সময়ই বলে থাকেন। ওলি ও সূফীদের এই ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতাকেই 'কাশ্‌ফ' শক্তি এবং তাঁদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বা সম্পাদিত বিষয় কার্যাবলীকে 'কারামত' বলা হয়। ওলি ও সূফীদের 'কাশ্‌ফ ও 'কারামত'ই এক জিনিস, আর যাদু, উইলফোর্স, হিপ্‌নোটিজম, থট রিডিং ও মেস্‌মেরিজমই অন্য জিনিস। এসব ভোজবাজীর সাথে ওলি ও সূফীদের 'কাশ্‌ফ' ও 'কারামত' এর তুলনা চলে না।

ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব ছিলেন কাশ্‌ফ-শক্তির অধিকারী একজন জবরদস্ত কামেল ওলি। তাঁর বহু কারামতও রয়েছে। আমরা এখানে তাঁর কাশফশক্তির ও কারামতের কতকগুলো জলন্ত মজির পেশ করছি। ইল্‌মে তসাসাউফের আলোকে এইগুলো বিচার্য।

(ক) রংপুরের কাঁশদহ গ্রামের মৌলবী রিয়াজুল হোসায়ন বলেছেন ঃ "আমি তরিকত সংক্রান্ত আটটি জটিল মছয়ালা মীমাংসা করে নেব—এই বাসনায় হযরত পীর সাহেবের নিকট গাইবান্ধা টাউন হল প্রাঙ্গণে যেয়ে উপস্থিত হই এবং তাঁকে বাতাস দিতে থাকি। হযরত পীর সাহেব আমার অন্তরের আটটি প্রশ্নের জওয়াব দান করে তাঁর থাকার নির্দিষ্ট বাসাতে চলে যান।"

(খ) নিজামপুরস্থ বাসখালীর মওলানা আবদুল জব্বার বলেছেন ঃ "আমি হযরত পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হয়েছিলাম। একবার হযরত পীর সাহেব নিজামপুরে আমার বাড়ীর দাওয়াত কবুল করে দিন-তারিখ নির্ধারিত করে দেন। এই সময় ইছাখালীর জবরদস্ত আলেম মওলানা সোলায়মান রহমান ঠাট্টা ক'রে আমাকে বললেন ঃ 'তুমি নাকি ফুরফুরার মওলানা সাহেবের কাছে মুরীদ হয়েছ, দেখবো এবার তোমার পীর কেমন?' তিনি কয়টি জটিল মছয়ালা ঠিক করে রাখলেন। হুজুর নিজামপুর তশরীফ আনলে জনাব মওলানা সোলায়মান রহমানকে হুজুর নামাজে ইমামতি করতে আদেশ দিলেন। মওলানা নামাজ শুরু করলে তাঁর শরীরে মহাকম্পনও শুরু হ'ল। তিনি অতিকষ্টে সূরা ফাতিহা শেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন—অন্য কোনো সূরার কোনো আয়াত তাঁর মনে পড়ছিল না। বহুক্ষণ পরে সূরা 'ফালাক' ও 'নাছ' পড়ে

নামাজ শেষ করলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন ঃ 'আপনি মানুষ আনেননি, একজন ফেরেশ্‌তা এনেছেন।' ওয়াজের মধ্যে হযরত পীর সাহেব তাঁর জটিল মছয়ালাগুলোর জওয়াব দান করেছিলেন। এ অবস্থা দর্শনে তিনি পীর সাহেবের গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিকট মুরীদ হয়ে গেলেন।"

(গ) নোয়াখালীর কল্যাণপুরীর মওলানা ফয়জুর রহমান বলেছেন ঃ "একবার নোয়াখালীর মওলানা গোলাম রহমান শায়খোলা থেকে কিছু সরু চাল নিজের মাথায় বহন করে ফুরফুরা শরীফে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর ছোট ছেলে ছিল। ছেলেটি বাতের দোষে বাকশক্তি হারা হয়ে পড়েছিল। হযরত পীর সাহেব তাঁকে দেখে বললেন ঃ "বাবা, তোমার পক্ষে চালের পোটলা মাথায় করে নিয়ে আসা ঠিক হয়নি।" তখন মওলানা গোলাম রহমান তাঁর ছেলের বাকশক্তি হারানোর কথা হযরত পীর সাহেবকে জানালেন। পীর সাহেব হুজুর দু'দিন ছেলেটির মুখে ফুঁক দিলেন, তারপর বললেন যে, ছেলেটি যেনো সকালে আজান দেয়। ছেলেটি সকালে আজান দিবার চেষ্টা করতেই তার জবান খুলে যায়।"

(ঘ) বগুড়া খঞ্জনপুরের সুফী ছায়েম উদ্দীন বলেছেন ঃ "আমি এক বার হযরত পীর সাহেবের খেদমতে ফুরফুরা শরীফ যেয়ে উপস্থিত হই। দু'চার দিন খেদমতে থেকে কিছু শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে আমি এসেছিলাম। হযরত পীর সাহেব মোরাকাবার তালিম দিয়ে বললেন ঃ 'বাবা, তুমি শীঘ্রই বাড়ী চলে যাও, কিছুতেই দেরী করতে পারবে না।' আমি, বললাম ঃ 'কয়েক দিন হুজুরের খেদমতে থাকার জন্য এসেছিলাম।' হুজুর বললেন ঃ 'না, বাবা চলে যাও।' বাড়ী ফেরার পথে কলকাতা উপস্থিত হয়ে দেখি, আমার সন্ধানে বাড়ী থেকে লোক এসেছে। আমার ওয়ালেদ সাহেব মরণাপন্ন। আমি বাড়ী পৌঁছে দেখি তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে। তিনি বললেন ঃ 'বাবা, সূরা ইয়াছিন পড়।' আমি সূরা ইয়াছিন পড়তে পড়তে দেখি, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। পরে দেখি তাঁর প্রাণবায়ু বের হয়ে গিয়েছে।"

(ঙ) নোয়াখালী জেলার মণিকপুর গ্রামের মওলানা আবদুল্লাহ বলেছেন ঃ "এক সময় আমরা পাঁচজন লোক ট্রেনে শিয়ালদহ উপস্থিত হয়ে ফুরফুরা শরীফ পৌঁছি। আমরা পীর সাহেবের বাড়িতে [illegible] অনুমিত মনে করে অন্য একজন লোকের মহলিতে যেয়ে [illegible] কিছু [illegible]

রেলী মশায় উপদ্রবে বাধ্য হয়ে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে হযরত পীর সাহেবের দহলিজে যেয়ে হাজির হলাম। আমরা হুজুরের বাড়ীর দহলিজে শয়ন করবার ইচ্ছা করলে আমাদের গ্রাম নিবাসী সেখানকার খোদাবন্দেহ মওলানা হাফিজুল্লাহ বললেন : 'আমরা কয়েকজন লোক আহার করতে বসেছিলাম। আমাদের আহারের বাসন দেওয়া হলে পীর সাহেব হুজুর বললেন : 'আরও পাঁচখানা বাসনে ভাত তরকারী দিয়ে উঠিয়ে রাখ।' আমরা বললাম : 'হুজুর, আমরা সকলেই বাসন নিয়ে বসেছি।' তিনি বললেন : 'পাঁচখানা বাসনে ভাত তরকারী দিয়ে উঠিয়ে রাখ।' আমরা বললাম : 'হুজুর আমরা সকলেই বাসন নিয়ে বসেছি।' তিনি বললেন : পাঁচখানা বাসনের ভাত তরকারী উঠিয়ে রাখ না কেন? যাক, আপনারা কয়জন লোক?' আমরা বললাম : 'আমরা পাঁচ জন।' তিনি বললেন, 'তাইতো পীর সাহেব আপনাদের জন্য ভাত-তরকারী রেখে দিতে বলেছিলেন।'

(চ) নোয়াখালীর কল্যাণদীর মওলানা ফয়জুর রহমান বর্ণনা করেছেন : "১৩৩৫ সালে ত্রিপুরার ধামতী আঞ্জুমানে ওয়ায়েজিনের বার্ষিক অধিবেশনের প্রথম দিবসে সভা আরম্ভের পূর্বক্ষণে প্রায় পাঁচ ছ' হাজার লোক উপস্থিত ছিল। পীর কেবলা সাহেব সবেমাত্র সভাস্থলে গিয়ে বসেছেন। সভার কার্য আরম্ভ হয়নি। আমি একখানা ফতোয়ায় দাস্তখত করানোর জন্য দোয়াত কলমসহ ফতোয়াখানা হাতে নিয়ে হজরত পীর সাহেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান। হুজুর আমাকে দেখে চোখ বন্ধ করে অনুমান পাঁচ মিনিট কাল মোরাকাবা করে চোখ খুলে বললেন : 'তোমার ফতোয়ার মধ্যে এই দোষ আছে, তা সংশোধন কর। সংশোধনের পর দস্তখত করব।' তিনি ফতোয়ার আবন্তীর মর্ম খুলে বললেন। এর আগে এই ফতোয়াখানায় প্রায় শতাধিক আলেম দাস্তখত করেছিলেন। কেউ-ই এই ভুল ধরতে পারেননি। আমি অবাক হয়ে গেলাম। সুবহানাল্লাহে বেহামদিহি।"

(ছ) ভবানীগঞ্জের মওলানা আজিজুর রহমান বলেছেন : "ফুরফুরার হজরত চরপৌয়া মজলিশে উপস্থিত হলে একজন লোক তার আটারো বছর বয়সের এক ছেলেকে নিয়ে সেখানে হাজির হল। ছেলেটি মায়ের পেট থেকেই বোবা হয়ে জন্মেছিল। মগরিবের নামাজের পর এই বোবা ছেলেটির পিতা হজরত পীর সাহেবের কাছে ছেলেটির বাকশক্তি ফিরে পাবার জন্য দোয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। আমি বললাম : 'হযরত পীর সাহেব দোয়া-

করবার পরে দোওয়া করবেন।' হুজুর বললেন : 'এশার অজিফার পরে দোওয়া করব।' অজিফার পরে তিনি বোবা ছেলেটিকে মুখ খুলতে ইশারা করলেন। ছেলেটি মুখ খুলে দাঁড়াল। হুজুর তিনবার ফুঁ দিলেন। অমনি তার জবান খুলে গেল। সে বাইরে যেয়ে তার বাবাকে ডাক দিল : 'বাবা, এদিকে আসেন।"

(জ) রামপুরার হাজী আশরাফ উদ্দীন পণ্ডিত বলেছেন : "আমি চট্টগ্রামের কাছেম আলী শাহাজীর সঙ্গে উপযুক্ত পীর ধরা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি মাইজভাণ্ডারের ভক্ত ছিলেন। তিনি বললেন : 'মাইজভাণ্ডারের পীরের উপর আপনার ভক্তি আসবে না।' আলোচনার মাঝে এক সময় তিনি বললেন : 'আপনার জন্য সুসংবাদ এনেছি। ফুরফুরার পীর সাহেব নোয়াখালীতে এসেছিলেন, তাঁকে দেখেছি, তাঁর কারামত দেখেছি।' নোয়াখালীর একটা লোক একটা বোবা ছেলেকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি বোবা ছেলেটির মুখে ফুঁক দিয়ে লোকটিকে বলে দিয়েছিলেন : 'তোমার ছেলে রাত্রে তিনবার পায়খানায় যাবে-ডাকবে; তুমি জবাব দিয়ো'। তাই হলো। সে থেকেই ছেলেটির বাক্‌শক্তি লাভ হয়েছিল। আমি এই কথা শুনে ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হলাম।"

(ঝ) ত্রিপুরা রূপশার জমিদার সৈয়দ আবদুর রশিদের কর্মচারী মুহম্মদ নূরুল হক বলেছেন : "আমার একটি অবিবাহিতা মেয়ের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। দেশের ডাক্তারেরা এর চিকিৎসা করতে অক্ষম হওয়ায় আমি তাকে নিয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের বড় বড় ডাক্তারকে দেখাই। সকলেই চোখ পরীক্ষা করে বললেন : 'চোখটি একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর চিকিৎসা অসম্ভব।" তারপর আমি মেয়েটিকে নিয়ে টিকাটুলি মসজিদে ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের কাছে যেয়ে উপস্থিত হই। তিনি আমাকে বললেন : 'বাবা, আমরা নব্য শিক্ষিত লোক, আমার উপর কি তোমাদের ভক্তি হবে?' আমি বল্লাম : 'ভক্তি না হ'লে আমি হুজুরের খেদমতে হাযির হলাম কি করে?' পীর সাহেব হুজুর আমার মেয়ের চোখে ফুঁক দিলেন এবং একখানা তাবিজ লিখে দিয়ে বল্লেন : "তাবিজটি কয়েকদিন চোখের উপর থাকবে। সাতদিন পরে তুমি আমার কাছে সংবাদ নিয়ে আসবে।' খোদার মর্জি সেই তারিখের মধ্যে আমার মেয়ের চোখ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায়।" এই সংবাদটি বা ঘটনাটি মরহুম মওলানা

রুহুল আমিন সম্পাদিত মাসিক 'সুন্নত-অল-জামায়াত' পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল।

(ঞ) চব্বিশ পরগণার মোয়াজ্জমপুরের হাজী সুলতান আহমদ বলেছেন : "একবার কলকাতার দক্ষিণে নৈতড়াতে ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব ওয়াজ করতে যান। ওয়াজের শেষের দিকে ফজরের নামাজের পর হুজুর পাল্কীতে উঠার সময় লোকদের তেল পানিতে ফুঁক দিতে দিতে উঠছিলেন। এমন সময় একটি লোক দৌড়ে এসে বলল : "আমার বোতলে ফুঁক লাগে নি।' প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছিলেন : 'হাঁ, ফুঁক লেগেছে'। এরপরও যখন লোকটি সে বোতল হযরত পীর সাহেবের সামনে ফুঁক দেওয়ার জন্য ধরল, তখন তিনি একটু হেসে তাতে ফুঁক দিলেন। ফুঁক দেওয়া মাত্রই বোতলের তলা খসে পড়ল। লোকটি হা-হুতাশ করে কাঁদতে লাগল।"

(ট) দরগাপুর কলোনী চব্বিশ পরগণার মওলানা বজলুর রহমান বলেছেন : হযরত পীর সাহেব শেষবারে বশিরহাট আগমন করে রাজে শাহী মসজিদের সামনে ওয়াজ করছিলেন। মণিমোহন ঘোষ নামে একজন হিন্দুলোক (বর্তমানে তাঁর নাম মনিরুজ্জমান খান) আমাকে বললেন : 'আমি চার পাঁচ শ' হাত দূর থেকে হযরত পীর সাহেবের দিকে লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম যে তাঁর চোখ থেকে ডে-লাইটের মত আলো বেরুচ্ছে।"

(ঠ) বগুড়ার সাবরুলের মুহাম্মদ আলী সাহেব বলছেন : "আমি একদিন জোহরের নামাজের আগে মনে করলাম : হযরত পীর সাহেব যদি আমাকে হুজরার মধ্যে সবক দিতেন, তবে বড় ভালো হ'ত। বাদ জুম্মা আমরা দায়রাশরীফে সবক মক্ষ করছি। অনেক লোক সেখানে আছে। কী আশ্চর্য! হুজুর এ অধমকেই কেবল দায়রা শরীফ সংলগ্ন হুজরাতে ডেকে সবক দিলেন।"

(ড) উক্ত মুহম্মদ আলী সাহেব বলেছেন : "একদিন বাড়ী থেকে ফুরফুরা রওয়ানা হওয়ার আগে আমার দাঁতের গোড়া দিয়ে অনবরত রক্ত পড়তে থাকে। আমি নিজেই চিকিৎসক, অথচ নানা রকম ওষুধেও কোন ফল পাইনি। আশ্চর্যের বিষয়, বগুড়া থেকে রওয়ানা হয়ে ফুরফুরাতে পৌঁছতেই হঠাৎ রক্ত বেরুনো বন্ধ হয়ে গেল। আজ তিন চার বছর হয়ে গেল আমার দাঁত দিয়ে রক্ত বের হয়নি।"

(ঢ) উক্ত মুহম্মদ আলী সাহেব আরো বলেছেন : "আমার একবার সর্দি, জ্বর, মত হ'য়ে নিউমোনিয়ার ভাব দেখা দেয়, তবুও সেই

অবস্থা ফুরফুরায় রওয়ানা হয়ে গেলাম। কলকাতা টিকাটুলি মসজিদে পীর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। হুজুর বললেন ঃ 'আমার সঙ্গে সীতাপুর এসো।' সীতাপুরে রাত্রে উপস্থিত হলাম কিন্তু খাবার সময় দেখি সাগু ভাতের পরিবর্তে ঘিয়ের পোলাও। আমি মনে মনে ভাবলাম ঃ আমার আমার জ্বর, সর্দি ও নিউমোনিয়া না হয়ে যাবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, জ্বর বাদ সর্দি জ্বর, হাতির বেদনা সব একেবারে সেরে গেছে। আমার চাচাতো ভাই মূসা বাল্যকালে মাসের মধ্যে দু'একদিন দু'তিন মিনিট কাল বেহুঁশ হয়ে পড়ত, এমন কি হাতের জিনিস কেড়ে নিলেও বলতে পারত না। আমার চাচা তাকে সঙ্গে করে পীর সাহেবের খেদমতে হাজির করলে পীর সাহেব হুজুর তার মাথায় ফুঁক দিলেন। আমার চাচা বললেন ঃ 'ব্যারাম আছে।' এতে পীর সাহেব আর এক ফুঁক দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়। সে অবধি আজ দশ পনর বছর চলে গেল, তার আর সেই ব্যারাম দেখা দেয়নি।"

(ন) গুজরা নগরের সূফী খবিরউদ্দীন বলেছেন ঃ "আমি সুন্দরবনে সাহেবের আবাদে গিয়েছিলাম। সেখানকার লোকেরা আমার কাছে লাঠিতে ফুঁক দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছিলেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন ঃ 'আমরা জঙ্গলে গিয়ে থাকি, সেখানে বাঘের ভয় থাকে। ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব আমাদের জন্য লাঠি পড়ে দিয়েছিলেন। আমরা চার দিকে লাঠি পুঁতে কাঠ কাটতাম, বাঘ সেই লাঠি দেখলেই চলে যেতো।"

এমন ধরনের অসংখ্য ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। উপর্যুক্ত ঘটনাগুলোর কথা মরহুম মওলানা রুহুল আমিন (রঃ) লিখিত 'ফুরফুরা হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে আমাদের এলাকায় হযরত পীর সাহেবের তশরীফ আনা উপলক্ষে সাধারণ মানুষের যে মহা উপকার হয়েছিল তার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। ঘটনাটি এই ঃ হযরত পীর সাহেব তাঁর ইন্তিকালের কয়েক বছর আগে মোমেনশাহী জেলার আঠার বাড়ী রেলওয়ে স্টেশনের মাইল খানেক দক্ষিণ-পশ্চিমে খালবলা মোকামের কাছাকাছি 'পানান' নামক মাঠে এক বিরাট ধর্মসভা উপলক্ষে তশরীফ এনেছিলেন। কাঁচামাটিয়া নদীর দক্ষিণ তীরস্থ এই পানান মাঠে কোনো তৃণ-লতাদি পর্যন্ত জন্মাত না- এমনই অনুর্বর ও মৃত মাঠে পরিণত হয়েছিল এই পানানের একটি বিস্তীর্ণ

এলাকা। হযরত পীর সাহেবের কাছে এই বিস্তীর্ণ মাঠের অনুর্বরতা ও মৃত অবস্থার কথা ঐ এলাকার বিশিষ্ট লোকেরা যেয়ে বললেন। তারা বললেন: 'হুজুর, এই পানান মাঠে কোন ঘাস, লতাপাতা পর্যন্ত জন্মেনি, এই বিরাট মাঠ সম্পূর্ণরূপে মানুষের অব্যবহার্য হয়ে দীর্ঘকাল পড়ে আছে। যদি এই বিস্তীর্ণ ভূমিতে ফসল ফলতো, তবে এতদঞ্চলের শতশত লোকের জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে যেত। আমরা এজন্য হুজুরের কাছে দোওয়া প্রার্থী হয়ে এসেছি।' হযরত পীর সাহেব এই কথা শুনে সকল লোকদের নিয়ে আল্লাহ্-রাব্বুল আলামিনের কাছে আজিজী ইনকেসারী সহকারে দোয়া করলেন এবং বললেন, 'বাবারা, আল্লাহ্ আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। এই পানানের মাঠ শস্য শ্যামলা হয়ে উঠবে।' সে থেকে পানানের এই মৃত মাঠ জীবন্ত হয়ে উঠে। সত্যিই ভাবতে আশ্চর্য লাগে: এরপর থেকেই এই পানান মাঠ ক্রমশ শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠেছে। এই বিস্তীর্ণে মাঠে লোকেরা বছরে প্রায় তিনটি ফসল ফলিয়ে থাকে।

'বুজুর্গী', 'কামালত', 'উচ্চদরজা' ও মুজাদ্দিদের মর্যাদালাভ সম্পর্কিত কতিপয় বর্ণনা

এ অধ্যায়ে আমরা ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের কামালত মুজাদ্দিদ ও বুজুর্গীর মান নির্ণয় করার জন্য যে সব বর্ণনার উল্লেখ করব সেগুলোর অধিকাংশই বুজুর্গও মোমিন ব্যক্তিদের স্বপ্ন বিবরণ থেকে গৃহীত হয়েছে। পীর আউলিয়াদের জীবন কাহিনীর বহু তত্ত্ব ও তথ্য এবং তাঁর উচ্চদরজার কথাও নির্ণীত হয় বহু মোমিন বুজুর্গের স্বপ্ন-বিবরণী দ্বারা। কারণ, পীর আউলিয়াদের জীবন আধ্যাত্মিক সাধনা, উন্নতি ও অগ্রগতির জীবন এবং হাদীস শাস্ত্রের বিশিষ্ট সহিহ গ্রন্থ বোখারী, মুসলিম, তিরমিজির বর্ণনা মতে—মোমিনের স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ অংশের এক অংশ। কাজেই ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীলোক মাত্রকেই মোমিন ও বুজুর্গ ব্যক্তির স্বপ্ন বিবরণকে তাজিমসহ গ্রহণ করতে হয়। এখানে প্রথমেই আমরা এ-সম্পর্কিত মরহুম ডকটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রদত্ত একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি তার 'ইসলাম প্রসঙ্গ' গ্রন্থে ফুরফুরার পীর সাহেব সম্পর্কিত আলোচনায় লিখেছেন: 'হযরত পীর সাহেব কেবলার (রঃ) আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আমি এখানে একজন নিরপেক্ষ আলিমের বর্ণনা পেশ করিতেছি। হযরত মৌলনা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) সাহেবের জীবনী 'আশরাফুস্ সওয়ানিহ' পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের ৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, মৌলানা আমীর হোসেন মাদ্রাসা সাহারানপুরী বলেন: একদা আমি স্বপ্নে দেখি একটা জলসা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সভাপতি হযরত নবী করীম (দঃ) হইয়াছেন। সভাশেষে লোকেরা বিভিন্ন প্রকারের মস্‌আলা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এ গোলামও সুযোগ বুঝিয়া হযরত (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিল যে, হযরত হাকীমুল উম্মত মৌলানা থানভী সাহেব এবং মৌলানা

আবুবকর ফুরফুরাভী সাহেব—ইঁহারা কেমন লোক এবং ইঁহারা যাহা কিছু বলেন তাহা শরীয়ত অনুযায়ী কিনা। তদুত্তরে হযরত নবী করিম (সাঃ) ফরমাইলেন ঃ উভয়েই নেক ব্যক্তি এবং ইঁহারা যাহা কিছু বলেন এবং লিখেন সে সমস্ত বিলকুল হক।"

সহিহ মুসলিম ও বোখারীতে বর্ণিত আছে ঃ আল্লাহ্‌র রসুল মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ "যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে নিশ্চয়ই আমাকে দেখে, কেননা শয়তান আমার ছুরত ধরতে পারে না।" এই হাদীস অনুসারে উপর্যুক্ত বর্ণনাটি নিঃসংকোচে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

মরহুম ডক্টর শহীদুল্লাহ আরও লিখেছেন : "হযরত পীর সাহেব কেবলা (রঃ) সম্বন্ধে স্বপ্নযোগে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর বহু উক্তি এবং তাঁহার বহু কারামতের বৃত্তান্ত তাঁহার জীবনীতে লিখিত আছে। আমি এখানে আমার জানা দুইটি কারামতের বিষয় উল্লেখ করিব।

একটি ঘটনা ঃ ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট অ্যাণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের ভূতপূর্ব কর্মচারী মৌলভীর আবদুস সামাদ সাহেব আমাকে বলেন যে, তিনি এক সময়ে পেটের ক্ষত (gastic ulcer) রোগে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পান। ঢাকার চিকিৎসকগণ তাঁহাকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে গিয়া অস্ত্র উপচার করিতে পরামর্শ দেন। তিনি কলিকাতায় গিয়া হযরত পীর সাহেব (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। পীর সাহেব তাঁহাকে তেল পড়িয়া দিয়া পেটের বেদনার স্থানে লাগাইতে বলেন। তাহাতে তিনি কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। ঢাকায় ফিরিয়া আসিলে তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহার অস্ত্র উপচারের কথা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি সমস্ত খুলিয়া বলিলে, বিনা অস্ত্র-চিকিৎসায় যে তিনি নীরোগ হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা আশ্চর্য হইয়া যান। তাঁহারা ইহা প্রথমে বিশ্বাস করিতেই চাহেন নাই। আর একটি ঘটনা এই ঃ আমাকে একজন ধুবড়ীবাসী মুসলমান এই বৃত্তান্ত বলেন,—ধুবড়ী শহরে নদীর ভাঙ্গনে তীরস্থিত ঘরবাড়ী, দোকান-পাট ধ্বংস হইবার আশঙ্কা হয়। তখন তিনি এই বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য পীর সাহেবের শরণাপন্ন হন। পীর সাহেব কয়েকটি বড় বড় শিকের উপর দোআ পড়িয়া নদীর কিনারায় পুঁতিয়া দিতে বলেন। সেইরূপ করা হইলে নদী সরিয়া যায় এবং ভাঙ্গন বন্ধ হইয়া যায়।"[১]

হযরত নবী করীম (সাঃ) এর সঙ্গে ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের নিসবত কিরূপ ছিল তা দেখানোর জন্য এখানে আমি ডক্টর শহীদুল্লার আরো দু'একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন : (ক) "পীর সাহেব কেবলা দু'বার হজ্ব সম্পাদন করেন—সন ১৩১০ এবং ১৩৩০ সালে। এই দ্বিতীয় হজ্জের সময় তাঁহার প্রায় তেরশত মুরীদ ও ভক্ত সঙ্গে গিয়াছিলেন। প্রথম হজ্জের সময় স্বপ্নে রসূলে মকবুলের (দঃ) দীদার হাসিল করেন। তাঁহার দর্শনে তিনি মুহব্বতে আত্মহারা হইয়া বলেন, হযরত আমার নাম 'আবদুর রসূল' রাখুন। আঁ-হযরত (দঃ) ঈষৎ হাস্য করিয়া ফরমাইলেন, 'না, আমি তোমার নাম আবদুল্লাহ রাখিলাম।' সেই হইতে পীর সাহেব নিজের নামের পূর্বে অনেক সময় 'আবদুল্লাহ' লিখিতেন।" (খ) "এক দিবস হযরত পীর সাহেব কিবলা (রঃ) স্বপ্নে দেখেন যে, নবী-এ-করীম (দঃ) আগে আগে যাইতেছেন, আর তিনি তাঁহার পিছনে পিছনে মসআলাসমূহ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যাইতেছেন এবং আঁ-হযরত (দঃ) তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন।"

ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব ছিলেন তাঁর যমানার মুজাদ্দিদ। মরহুম ডক্টর শহীদুল্লাহ ও হযরত পীর সাহেবের মুজাদ্দিদ হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি নিজে লিখে গেছেন : "আমরা হুজুর কেবলার সহিত দিল্লী পৌঁছিয়া হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রঃ) সাহেবের পীর হযরত বাকী বিল্লাহ (রঃ), হযরত কুতবুদ্দিন বখতিয়ার বাকী (রঃ), হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (রঃ) সাহেবানের এবং অন্যান্য বোযর্গানের মাযার যিয়ারত করি। চারিদিন পরে আমরা হজুর কেবলার সহিত আজমীর শরীফে যাত্রা করি। সেখানে দুইদিন থাকিয়া হযুর কেবলা খাজা সাহেবের দরগাহে যে সমস্ত শির্ক ও বিদআত কাজ হয়, তাহার বিরুদ্ধে ওয়াজ করেন এবং দান খয়রাত করেন। আজমীর শরীফ হইতে আমরা হুযুর কেবলার সহিত সরহিন্দ শরীফে রওয়ানা হই। সেখানে ১০।১২ দিন তিনি ওয়াজ নসীহত করিয়া কাটান এবং দান-খয়রাত করেন। বিদায়দিনে সেখানকার মুতাওল্লী সাহেব তাঁহাকে কিছু উপহার দিয়া বলেন : আমি হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের তরফ হইতে এই সমুদয় তোহফা হযুরকে দিতে আদিষ্ট হইয়াছি। আরও ইহা

জানিতে পারিয়াছি যে আপনি এই যমানার মুজাদ্দিদ। এই বলিয়া তিনি উল্লাসের সহিত হুযুরের মাথায় মুজাদ্দেদী টুপী পরাইয়া দিলেন।"[৪]

হাওয়ানেহে ওমরির ৫১/৫২ পৃষ্ঠার বরাত দিয়ে হযরত মওলানা মুহম্মদ আমিন (রঃ) ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের মুজাদ্দেদী হওয়া সম্পর্কে লিখে গেছেন ঃ

"জামানার আবদাল মওলানা হাফেজ আবদুর রহমান সাহেব, ইনি আমার শিক্ষক ও আমার ওয়ালেদ মওলানা শাহ আবদুল বাসেত ফারুকি নক্‌শবন্দী মোজাদ্দেদী চিশ্‌তী সাহেবের পীর ছিলেন। আমি নিজে কয়েকবার দেখিয়াছি যে, তিনি লোকের মধ্য হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইতেন। আবার কিছুক্ষণ পরে প্রকাশ হইয়া পড়িতেন। লোকেরা তাঁহাকে একই সময় দুই-তিন স্থানে দেখিতে পাইত। তাঁহার খেদমতে মোয়াবাহিক ১১ বৎসর এবং অতঃপর মধ্যে মধ্যে আরও ৭ বৎসর ছিলাম। তিনি ইন্তিকালের ৩ মাস পূর্বে নিজের মৃত্যু-সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহার কদম মোবারক ধরিয়া আরজ করিয়া বলিলাম, "আপনি আমাকে মুরিদ করাইয়া লউন।" তদুত্তরে তিনি বলেন, 'তোমার জন্য অন্য স্থানে নির্দিষ্ট রহিয়াছে।' আমি বহুক্ষণ রোদন করিতে থাকিলে, তিনি বলিলেন ঃ 'তুমি চিন্তা করিও না। খোদার উপর ভরসা কর,আমি তোমার পীরের সন্ধান প্রদান করিতেছি, তুমি তাঁহার নিকট চলুক সমাপ্ত করিবে।' সেই সময় ফুরফুরার হযরতের নাম উল্লেখ করেন। প্রথম হইতে তাঁহার উপর আমার তাদৃশ ভক্তি ছিল না, কাজেই ইহাতে আগ্রহ কম হওয়ার কথা, কিন্তু তিনি বলিলেন, 'মিঞা, তুমি বুঝ না, ফুরফুরার পীর সাহেব এই শতাব্দীর মোজাদ্দেদ। আমি বাল্যকাল হইতে তাঁহার মধ্যে মোজাদ্দেদ হওয়ার লক্ষণ দেখিতেছি।' হযরত মওলানা ইয়াজ উদ্দীন সাহেব অনেক সময় বলিতেন, ফুরফুরার হযরত জামানার মোজাদ্দেদ। প্রেসিডেন্সী কলেজের আরবী ভাষার প্রফেসর মৌলবী আবদুল খালেক বলিয়াছেন, একজন সৈয়দ সাহেবের বাটী পাঞ্জাব ও পেশোয়ারের মধ্যস্থলে ছিল, তিনি হায়দারাবাদে থাকিতেন। তাঁহার একপুত্র মদিনা শরীফে থাকিতেন। হযরত নবী (ছাঃ) স্বপ্নযোগে তাহাকে বলেন ঃ "তোমার পিতাকে বলিয়া দাও, তিনি যেন জামানার মোজাদ্দেদ ফুরফুরার পীর সাহেবের নিকট গমন করেন এবং আমার সালাম জানাইয়া দেন।"

"উক্ত প্রফেসার মৌলবী আবদুল খালেক সাহেব আরও বলিয়াছেন, একজন সীমান্ত প্রদেশের গাজী মওলানা স্বপ্নযোগে হজরত মোজাদ্দেদ আলফে ছানী (রঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন ঃ যদি তুমি এই জামানার মোজাদ্দেদকে দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে ছারহান্দে চলিয়া আইস।' তিনি ছারহান্দে উপস্থিত হইয়া কিছুকাল তথায় থাকেন। পুনরায় তিনি মোজাদ্দেদ সাহেবকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন ঃ সেই মোজাদ্দেদ সাহেব কোন্ বাড়ি ? তিনি বলেন ঃ তুমি আরও কিছুকাল অপেক্ষা কর।' তিনি এস্থলে আগমন করিলে তোমাকে অবগত করান হইবে।' তিন মাস পরে ফুরফুরার হযরত ছারহান্দ শরীফে আগমন করিলে মোজাদ্দেদ আলফে ছানী (রঃ) স্বপ্নযোগে তাঁহাকে বলেন যে এখন তিনি এইস্থলে আগমন করিয়াছেন।

"ফরিদপুরের অন্তর্গত রাজধরপুরের মওলানা আফছার উদ্দীন সাহেবের মুখে শুনিয়াছি ঃ যে সময় ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব রঙপুর সদরের অধীনে প্রফেসার মৌলবী মোহাম্মদ হোছেন সাহেবের রাধানগর গ্রামস্থ মাদ্রাসাতে শুভাগমন করেন, সেই সময় মৌলানা মনিরুজ্জমান ইছলামাবাদী সাহেব তাঁহার নিকট মৃত পীর বোজর্গদিগের সহিত সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে 'কাঁশফোল কবুর' এর মোরাকাবার ইজাজত লাভ করেন।

"তিনি মালদহের সাদুল্লাপুরে চিশ্‌তিয়া তরীকার প্রসিদ্ধ পীর হযরত আখি সিরাজ (কোঃ)-এর মাজার শরীফে 'কাশফুল কবুরের' মোরাকাবা-কালে তিন বার উক্ত হযরতের সহিত সাক্ষাত লাভ করেন, কিন্তু প্রত্যেক বারেই তিনি ফুরফুরার হযরতের আকৃতি ধরিয়া দেখা দেন। মওলানা সাহেব এইরূপ আকৃতি ধারণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ইহাতে তিনি বলেন : ফুরফুরার পীর সাহেব এই জামানার মোজাদ্দেদ। এই হেতু আমি তাঁহার আকৃতি ধরিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি ইল্‌মে শরীয়তের রক্ষণাবেক্ষণ করতঃ নবীর দীন সজীবিত করিয়াছেন।"[৫]

উক্ত মওলানা আফছার উদ্দীন সাহেব বলেছেন ঃ "আমি মেছুয়া বাজারে জমিয়ত অফিসে ছিলাম। সেই সময় ফুরফুরার হযরতের বড় সাহেব-জাদা মওলানা আবদুল হাই সাহেব বাড়ীতে পীড়িত ছিলেন। হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম যেন পীর সাহেব বলছেন ঃ 'বাবা মওলানা আফছার উদ্দীন, এই ঔষধটি নিয়ে এসো।' আমি এই ঔষধ নিয়ে ফুরফুরা শরীফে উপস্থিত

হলাম এবং পীর সাহেবকে এই ঘটনার কথা বললাম। হযরত পীর সাহেব বললেন : হাঁ বাবা, আমি বলেছিলাম : যদি মাওলানা আফছারউদ্দীন এখানে থাকতেন, তবে আবদুল হাই এর জন্য এই ঔষধটি এনে দিতে পারতেন।"[৬]

উক্ত মওলানা আফছার উদ্দীন সাহেব আরো বলেছেন : "এক সময় আমরা ফুরফুরার হযরতের সঙ্গে কোন দাওয়াতে গিয়েছিলাম, তিনি পাল্কীযোগে ট্রেন আসার পূর্বেই ষ্টেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের ষ্টেশনে পৌঁছুতে বিলম্ব হ'ল। তাঁর আসবাবপত্র সমস্ত আমাদের সঙ্গে ছিল। ট্রেন ষ্টেশনে এসে গেল। আমাদের ষ্টেশনে পৌঁছুতে ট্রেনের নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা প্রায় আধা ঘন্টা দেরী হল। ষ্টেশনে পৌঁছে দুনি লাইনের পয়েন্ট নষ্ট হয়ে আছে। ষ্টেশনে দু'খানা ট্রেন একত্র হয়েছিল। লাইন ঠিক করে গাড়ী দুটি ছাড়তে প্রায় আধা ঘন্টা সময় অতিবাহিত হল। আমরা ষ্টেশনে পৌঁছে টিকেট কেটে গাড়ীতে, ওঠামাত্রই গাড়ী ষ্টেশন ছেড়ে চলল।"[৭]

উপর্যুক্ত বর্ণিত বিষয়গুলো থেকে আমরা ফুরফুরার হযরত পীর আবুবকর সিদ্দিক (রঃ)-এর মুজাদ্দিদের মর্যাদা ও কামালিয়তের দরজা সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবহিত হয়েছি। পাঠকদের পক্ষে ও তাঁর উচ্চ দরজা ও মুজাদ্দিদের মর্যাদা লাভের কথা অবগত হওয়া সহজসাধ্য হবে।

৬. হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী : মওলানা রুহুল আমিন।
৭. হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী : মওলানা রুহুল আমিন।

বুজর্গানে দ্বীনের মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর

দলেবলে পীর আউলিয়াদের মাজার জিয়ারতকে অনেকেই বেদআত, নাজায়েয কার্য বলে মনে করে থাকেন এবং মাজারস্থ বুজর্গের কাছে দোওয়া প্রার্থী হওয়া শেরেকী কর্ম বলে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। আমরা এখানে মাজার জিয়ারত কি এবং কেন মাজার জিয়ারত করতে হয় আলহাজ খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ্ (রঃ) এম-এ, এম-আর-এস-এ, আই-ই-এস এর জবানীতে প্রকাশ করছি। তিনি লিখেছেন ঃ

"আমি মজার জিয়ারত করি, মাজারকে সম্মান প্রদর্শন করি। কেউ চায় না যে, তাহার পূর্ব-পুরুষের স্মৃতি অনাদৃত হয়। কোনো মাজার অপরিষ্কৃত দেখিলে স্বয়ং মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। আর কোনো মাজারকে পরিচ্ছন্ন বা আলোকিত দেখিলে মনও খোশ হয়। মাজারের অন্তর্গত রুহ শরীর-হীন। অন্ধকার বা আলোক দেহহীনের পক্ষে অর্থহীন, কিন্তু আমরা আনন্দ পাই, যদি কোনো পূর্ব-পুরুষের স্মৃতি সম্মানিত হয়।

"আমার মনে হয় না, মাজারকে কেহ খোদা মনে করিয়া পূজা করে, হয়তো মাজারের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু পূজার উদ্দেশ্যে নহে, সম্মানের উদ্দেশ্যে। তারপর কে জানে মাজারের সহিত রুহের কখনো কোনো সংস্রব থাকে না? যেরূপ বিদেশে থাকিলে মানুষ স্বদেশে আসিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ যেখানে রুহ দীর্ঘকাল শরীরসহ খেলাধুলা করিয়াছে, মৃত্যুর পরেও সেখানে আকর্ষণ থাকে। আর যখন ইচ্ছা রুহ সেই স্থানে চলাফেরা করিতে পারে। রুহ যে দেহমধ্যে বহু দিন অতিবাহিত করিয়াছিল, সে দেহ যেখানে সমাহিত হয়, স্বভাবত সে স্থানের জন্য রুহের আকর্ষণ থাকে। তাই সে স্থানটি পরিষ্কৃত বা পরিচ্ছন্ন রাখিলে বা সেখানে আলোক, ধুপ বা সুগন্ধ বিস্তার করিলে রুহ খোশ হইবার কথা। মৃত্যুর পরে রুহ কয়েদ হইতে মুক্ত হয়।

যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারে, সে তখন সময় বা স্থানের বেড়ী অতিক্রম করে।

"গরীব মিছকীনকে খাওয়াইলে আর সেই খানার ছওয়াব রুহে পৌঁছাইয়া দিলে খোদা তাহার বিনিময়ে রুহের উপর শান্তি বর্ষণ করেন। ফাতেহা পড়িয়া বখশিয়া দিলেও সেই কথা।

"মৃত ব্যক্তির মাজারে কিছু যাচ্ঞা করা কেহ নাজায়েজ মনে করেন। তাঁহারা স্বয়ং খোদাকে ছাড়িয়া মানুষের কাছে হাত পাতেন না। ইহার অর্থ এই নহে যে, মাজারস্থ রুহকে খোদার পদে উন্নীত করা হইতেছে। যে সকল রুহ খোদার ভক্ত, খোদার কাছে তাঁহারা যদি কাহারও জন্য প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে খোদা তাহা শুনিতে পারেন। আমরা দেহী বোজর্গ দেখিলে দোওয়া চাই, আর দেহহীন বোজর্গের নিকট দোওয়া চাওয়া নাজায়েজ মনে করি। দিবারাত্র আমরা উপরস্থ কর্মচারী বা মনিবের নিকট দোওয়া চাই, আর লোকান্তরিত রুহের নিকট দোওয়া চাহিলে নাজায়েজ হয়, এসব কূটবুদ্ধির কূটতা। লোকান্তরিত হইলে রুহের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। দেহের বেড়ীর মধ্যে সে মজবুর ছিল, এখন দেহ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সে অধিকতর ক্ষমতাশালী। দেহী বোজর্গ অপেক্ষা লোকান্তরিত বোজর্গ অধিকতর উপকার সাধনে সমর্থ।"

বুজর্গানে দীনের মাজার জিয়ারত শরীয়তসম্মত পুণ্যকার্য ও ব্যক্তিগত জীবনে লাভজনক মহৎ কার্য বলেই ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব একাধিকবার মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বিদেশে সফর করেছেন। মওলানা রুহুল আমিন (রঃ) লিখেছেন : যে তিনি হযরত পীর আবুবকর সিদ্দিকীর সংগে ভারতবর্ষের বিখ্যাত পীর আউলিয়া শহীদদের মাজার জিয়ারত করেছিলেন।

কোন বুজর্গের দেহী রুহের চেয়ে দেহ-মুক্ত রুহের ক্ষমতা যে অধিক মওলানা রুহুল আমিন সাহেবও তা স্বীকার করে গেছেন। তিনি লিখেছেন : "জীবিত পীরদিগের দ্বারা যে রূপ রুহানী ফয়েজ লাভ হয়, মৃত পীরদিগের দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিকতর রুহানী ফয়েজ লাভ হইয়া থাকে।"[৪]

দেহান্তরিত বুজর্গ ও আউলিয়াদের রুহানী ফয়েজ লাভের উদ্দেশ্যেই সাধারণতঃ মাজার জিয়ারত করা হয়ে থাকে।

৪. হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী: মওলানা রুহুল আমিন পৃঃ ১৭৬—৮৬

পীর সাহেবের মহৎ ও জনহিতকর কার্যাবলী

ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব বহু জনহিতকর মহৎ কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নিম্নে তার কয়েকটি প্রদত্ত হবে ঃ

(ক) বলকান যুদ্ধে তুরস্কের আহত সৈন্য ও তাদের স্ত্রী-পুত্রদের সাহায্যার্থে তিনি প্রায় ষাট হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে যথাসময়ে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। কলকাতার চাঁদনি বাজার অঞ্চলে ও হাওড়া রামকৃষ্ণপুর হাটে মুসলমান ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এক দিনেই তিনি বিশ হাজার টাকা চাঁদা তুলেছিলেন।

(খ) ত্রিপলীর যুদ্ধকালে ও আরা শাহাবাদের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা কালে তিনি হাজার হাজার টাকা চাঁদা তুলে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত মুসলমানদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

(গ) ১৩২৬ বাংলা সনের আশ্বিন মাসে যে ভীষণ ঝড় হয়েছিল, সেই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা তুলে পাঠিয়েছিলেন।

(ঘ) মসজিদ ও গোরস্থানের অবস্থান বা জায়গা জমি নিয়ে যেখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত হ'ত তিনি সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হতেন শান্তিও সাহায্যের ভান্ডার নিয়ে এবং বিপদগ্রস্ত মুসলমানরা তাঁর কাছ থেকে সহানুভূতি লাভ করে আশ্বস্ত হ'ত।

(ঙ) মৌলবী আবু নসর অহিদ ওল্ডস্কীম মাদ্রাসাগুলো উঠিয়ে দিয়ে তদস্থলে নিউস্কীম মাদ্রাসা স্থাপন করতে জোর চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এমন কি যখন কলকাতা মাদ্রাসাকে নিউস্কীম মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করার জন্য চেষ্টা করছিলেন, তখন ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব তার ঘোর প্রতিবাদ করেন এবং তাঁর তীব্র প্রতিবাদের মুকাবিলা করার ক্ষমতা হারিয়ে জনাব অহিদ সাহেব কলকাতা ওল্ডস্কীম মাদ্রাসাকে নিউস্কীমে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা স্থগিত রাখেন। এদিকে হযরত পীর সাহেব তাঁর সুযোগ্য

খলিফাদের সহযোগিতা, উৎসাহ ও উদ্যমে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে বহু ওল্ডস্কীম জুনিয়ার ও সিনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপন করে চল্‌লেন। তিনি রংপুর নীলফামারীর অধীন সৈয়দপুর বাঙালী পাড়াতে ওল্ডস্কীম দারুল উলুম মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং নিজের পকেট থেকে প্রথম পঁচিশ টাকা চাঁদা দান করেন এবং নগদ ও প্রতিশ্রুত সাত হাজার টাকা আদায় করার ব্যবস্থা করে আসেন।

(চ) হযরত পীর সাহেব নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্রাসায় শুভাগমন করে নগদ ১৩২৬,৬২ টাকা চাঁদা তুলে দেন এবং নানাবিধ সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়ে মাদ্রাসার ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। তাঁরই প্রেরণায় এই মাদ্রাসাটি বঙ্গদেশের আদর্শ-স্থানীয় মাদ্রাসায় পরিণত হয়েছিল একসময়।

(ছ) তিনি বগুড়ার ওল্ডস্কীম মোস্তাফাবিয়া মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁরই প্রেরণায় সেটা একটি উঁচু মানের মাদ্রাসায় পরিণত হয়েছিল।

বরিশালের শর্ষিনার হযরত মওলানা শাহ সূফী নেসারউদ্দীন আহমদ (রঃ)-এর বাড়ীর ওল্ডস্কীম সিনিয়ার মাদ্রাসারও ভিত্তিপ্রস্তর তিনি স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে শর্ষিনার ওল্ডস্কীম মাদ্রাসা বাংলাদেশের একমাত্র আদর্শস্থানীয় মাদ্রাসায় পরিণত হয়েছে।

(ঝ) ফুরফুরার ওল্ডস্কীম সিনিয়ার মাদ্রাসা ও হাদীস শরীফের দাওরা পর্যন্ত পাঠদানের মাদ্রাসা হযরত পীর সাহেবের এক অক্ষয় কীর্তি। এতে শতশত বিদেশী ছাত্র অধ্যয়ন করে থাকে। তাঁর বাড়ীতে একটি নিউস্কীম সিনিয়ার মাদ্রাসাও রয়েছে। তিনি বহু গরীব ছাত্রকে ফ্রী, হাফ ফ্রী দান করতেন এবং সেই ব্যয় তিনি নিজেই বহন করতেন। ১৫০ হাত দীর্ঘ একটি বিরাট পাকা গৃহ এই মাদ্রাসার জন্য ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয় এবং এর অর্ধেক খরচ তিনি নিজেই বহন করেন। অধিকন্তু বার্ষিক এই দুই মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি তাঁর আটাশ হাজার টাকার সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ্‌ করে দিয়েছেন।

(ঞ) হযরত পীর সাহেব 'ইল্‌মে তাসাউওফ' শিক্ষা দানের জন্য তাঁর বাড়ীতে দারুল্লাখানা বা 'খানকা শরীফ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলা, আসাম, আরব, পারস্য, তুরস্ক, কাবুল, কান্দাহার, বর্মা প্রভৃতি দূর দেশ থেকে বহু তরীকত অন্বেষী লোক হযরত পীর সাহেবের কাছে এসে হাজির হতো এবং কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্‌শবন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া তরিকা এই খানকাহ্‌ শরীফে অবস্থান করে শিক্ষালাভ করে দেশে ফিরে যেতো।

(ট) হযরত পীর সাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দশ হাজার টাকা ব্যয়ে তার বাড়ীতে একটি কুতুবখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও তাঁর বাড়ীতে স্থাপিত হয়েছিল। দেশ-বিদেশের জটিল মস-আলা-মাসায়েলের মীমাংসার জন্য 'দারুল ইফ্‌তা' স্থাপন করা হয়েছিল। এগুলো আজ পর্যন্তও সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

(ঠ) হযরত পীর সাহেব হজ্ব করতে যেয়ে একবার তাঁর আত্মীয়া বেগম সোলতুন্নেসা তুর্ক প্রতিষ্ঠিত মক্কায় সৌলতিয়া মাদ্রাসায় এক হাজার টাকা দান করে এসেছিলেন। সে বাঙলা ১৩৩০ সালের কথা।

(ড) যখন 'মিহির' ও 'সুধাকর' নামীয় সাপ্তাহিক পত্রিকাটি মাননীয় নবাব আলীর পরিচালনায় ও মুন্সী শেখ আবদুর রহিম এবং সৈয়দ ওছমান আলীর যুগ্ম সম্পাদনায় বের হয়, তখন হযরত পীর সাহেব এর সহায়তা করেন। 'মোহাম্মদী' পত্রিকাটি যখন প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়, তখন মওলানা আকরম খাঁ ফুরফুরার পীর সাহেবের শরণাপন্ন হন। হযরত পীর সাহেব পত্রিকাটির স্থায়িত্বের জন্য দোওয়া করেন এবং জনসাধারণকে 'মোহাম্মদী' গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধ জানান। তাঁর উৎসাহ ও আবেদনে 'মোহাম্মদী' পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।

'মিহির ও সুধাকর' বন্ধ হয়ে গেলে মুসলমান সমাজ একটি জাতীয় সংবাদপত্রের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করে। সেই দারুণ অভাবের কথা হযরত পীর সাহেবের কর্ণগোচর করা হলে তিনি সুসাহিত্যিক মুন্সী শেখ আবদুর রহিম ও অপর কয়েকজন সমাজ সেবকের সাহায্যে বাং ১৩১৭ সালের ৮ই মাঘ কলকাতা ষ্ট্রীয়ার পার্কে আঞ্জুমানে ওয়ায়েজিনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সভায় হযরত পীর সাহেবকে 'মোসলেম হিতৈষী' নামীয় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য অনেকেই অনুরোধ জানান। তিনি তাদের অনুরোধে তাঁর দানশীল ভক্ত মুরীদানদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে একটি প্রেসের যাবতীয় সরঞ্জাম খরিদ করার ব্যবস্থা করে দেন।

তারপর তাঁর প্রচেষ্টায় 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজিনের' পক্ষ হতে 'ইসলাম দর্শন' বের হয়। তাঁর দোওয়া ও চেষ্টাতে 'হানাফী' পত্রিকাটি আট বৎসর সুপরিচালিত হয়েছিল। 'শরীয়ত', 'ছুন্নত-অল্-জামায়াত,' 'মোসলেম' প্রভৃতি পত্রিকাগুলো তাঁর অর্থানুকুল্যেই চলতো।

(চ) তাঁর বাড়ীতে বাৎসরিক 'ইসালে ছওয়াবের' মহফিল প্রতিষ্ঠা হযরত পীর সাহেবের আর এক মহৎ কীর্তি। প্রতিবৎসর ফাল্গুন মাসের ২১।২২।২৩ তারিখে পীর সাহেবের বাড়ীতে এক বিরাট মজলিস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এতে বাংলা, আসাম ও হিন্দুস্তানের নানান জায়গা থেকে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়ে থাকে। এই জলসা একটি খাঁটি ইস্‌লামী জলসা এবং একেই 'ইসালে ছওয়াবের' জলসায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই জলসায় কোনোরূপ বেদয়াতি কার্য বরদাশত করা হয় না।

ইসালে ছওয়াব

এই ইসলামী বাৎসরিক সভার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সভাস্থ কোন লোকই সিগারেট, তামাক সেবন করে না। প্রায় সবারই একই ধরনের পোষাক। একই সুন্নতের পাবন্দ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ বড়ই সুন্দর দেখায়। সমাগত লোকদের আদব-কায়দা, প্রাণের আবেগ, মহব্বত, চাল-চলন, পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও অনুরাগ দেখে মন জুড়ায়, বেহেশ্‌তী মাধুর্য অনুভূত হয়।

হযরত পীর সাহেব জীবদ্দশায় দেশী-বিদেশী লোকদের আদর-যত্ন খাওয়া-দাওয়ার তদারক কার্য, অসুখ অসুবিধা প্রভৃতি নিজ চোখে সভার মাঠের প্রত্যেক স্তরে ঘুরে ঘুরে দেখতেন। সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করতেন। সমস্ত দিবস ও অর্ধরাত্রি পর্যন্ত তিনি নিজে অনাহারে থেকে সকলের খাওয়া দাওয়ার শেষে সামান্য কিছু আহার করতেন। হযরত মওলানা রুহুল আমিন (রঃ) লিখেছেন : সময়ে সময়ে হজরত পীর সাহেবকে কাঠ হাতে লইয়া আসিতে দেখিয়াছি, তদ্দর্শনে শত শত মওলানা মৌলবী দরবেশকে কাঠ স্কন্ধে লইয়া তাঁহার পাছে ছুটিতে দেখিয়াছি। ইহা হযরত নবী (ছাঃ)-এর সুন্নত। বহু নামজাদা আলেমকে নিজেদের সম্ভ্রম ও মর্যাদার কথা ভুলিয়া গিয়া সমাগত লোকদিগের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার জন্য খেদমতগার রূপে দিবারাত্র দৌড়াদৌড়ি করিতে দেখিয়াছি।"[১]

এই ইসালে ছওয়াবের সভায় কখনো বৃষ্টিপাত হলে সভাস্থ লোকদের বিশেষ কষ্ট হতো। এজন্য হযরত পীর সাহেব তাঁর খলিফাগণের

১. হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী : মওলানা রুহুল আমিন।

আন্তরিক সহযোগিতায় একটি সুবৃহৎ টিনের প্যাণ্ডেল তৈরী করে রেখে গেছেন। এর নির্মাণ খরচের জন্য তিনি নিজে কয়েক হাজার টাকা দিয়েছেন এবং তাঁর খলিফা ও অনুগত মুরিদগণ বহু টাকা চাঁদা দিয়েছেন।

এই ইসালে ছওয়াবের সভাতে বাংলা ও আসামের বড় বড় ওয়ায়েজ ও সহস্রাধিক যোগ্য আলেম তশরিফ রাখতেন। তাঁরা তিন চার দিবস সদা-সর্বদা কুরআন-হাদীস, মস্‌আলা-মাসায়েল ও বুজুর্গানে-দীনের আমল-আখলাক, জীবন কাহিনী, ইবাদত-বন্দেগী প্রভৃতি বর্ণনা করতেন। আজও তা অব্যাহত রয়েছে। মওলানা রুহুল আমিন লিখেছেন ঃ "এত অধিক সংখ্যক উলামা সম্প্রদায়ের সমাবেশ বঙ্গ-আসামের এবং হিন্দুস্তানের কোন স্থানে হইয়া থাকে বলিয়া আমি জানি না।"[২]

ফুরফুরার ইসালে ছওয়াবের জলসাতে কেউই কোনো কিস্‌সা কাহিনী বর্ণনা করতে কিংবা কোনো রাগ-রাগিণীসহ গজল গাইতে পারেন না। হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী (রঃ)-এর মাজারে যে ভাবে 'ইসালে ছওয়াব' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের বাড়ীর ইসালে ছওয়াবও তারই অনুকরণে অনুষ্ঠিত হয়। সেরহিন্দ শরীফে হযরত মুজাদ্দেদ (রঃ)-এর মাজারে প্রতি বৎসর ২৬শে সফর হতে ২৮শে সফর পর্যন্ত ইসালে ছওয়াব মহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং উক্ত মহফিলে হাজার হাজার বরগুজিদা বুজর্গ শরীক হয়ে ফয়েজ হাসিল করেন। এই মহফিলে শরীয়তে পাবন্দীর উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয় এবং সুবহে-শাম কেবলমাত্র কালামুল্লাহ্ শরীফ খতম করা হয়। কোন কোন সাহেবান উত্তম কাসিদা নাতিয়াও পাঠ করে থাকেন।"[৩]

ফুরফুরার ইসালে ছওয়াবের মহফিলে সেরহিন্দ শরীফের গদীনসীন পীর সাহেব ও তার একজন সহচর এবং বাবা শেখ ফরিদ গাঞ্জেশকর (রঃ)-এর গদীনসীন পীর ও আজমীর শরীফের মাননীয় খাদেম সাহেব তশরীফ আনতেন। এ ছাড়াও হিন্দুস্তানের বড় বড় বুজর্গ ও আলেম সাহেবান এবং মক্কা ও মদীনা শরীফের বহু আলেম ও মুয়াল্লিম পীরসাহেব হুজুরের জীবদ্দশায় ফুরফুরার ইসালে ছওয়াবের মহফিলে

২. হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী ঃ মওলানা রুহুল আমিন।

তশরীফ রাখতেন। শুনেছি, এখনও তাঁরা তশরীফ এনে থাকেন। সেরহিন্দ শরীফের গদীনসীন পীরসাহেব একবার ফুরফুরার খানকা-শরীফের এক কোণে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন: আমি তন্ন তন্ন করিয়া ফুরফুরা শরীফের ইসালে ছওয়াবের মহফিল দেখিলাম। অবিকল এইরূপ ইসালে ছওয়াব ছারহান্দ শরীফে হইয়া থাকে; একতিল একবিন্দু কম বেশী হইয়া থাকে না।[৪]

হযরত পীর সাহেব এইসব সম্মানীয় মেহমানদের যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করতেন, তাছাড়া শতাধিক টাকা তাঁদের নজরও দিতেন।

এই ইসালে ছওয়াবের সভায় বুজর্গ ও খ্যাতনামা আলেমগণ ওয়াজ নসীহত করতে, তাঁদের রচিত, পীর সাহেবের খলিফা ও সাহেবযাদাদের রচিত বহু দ্বীনি কিতাবেরও তথায় প্রচার হতো। ইসালে ছওয়াব করতে যারা আসতেন, তারাও আবশ্যক অনুযায়ী দ্বীনি কিতাব কিনে নিতেন। এতে স্থায়ী হেদায়েতের ব্যবস্থা হয়ে যেত। পীরসাহেব হুজুর মাঝে মাঝে লোকদের এ সব দ্বীনি কিতাব কিনে নিতে উৎসাহ দিতেন।

তিনি প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজ শেষে সমাগত লোকদেরকে তাকওয়া, পরহেজগারী, পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন ও এখতেলাফী সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দান করতেন। শেষ রাত্রে সমস্ত রাত্রি-ব্যাপী ওয়াজ-নসীহতের পর দোওয়া মোনাজাতের পূর্বে তিনি সবাইকে তাঁর শেষ নসীহত শুনিয়ে দিতেন এবং রাত্রিব্যাপী অবস্থানজনিত কষ্ট ও বিভিন্ন অসুবিধা ও দুর্ভোগজনিত দুঃখ-কষ্টের জন্য মাফ চেয়ে নিতেন। এ ভাবেই ফুরফুরার ইসালে ছওয়াবের জলসাতে এলমে শরীয়ত প্রচারের ব্যবস্থা হত এবং আজ-তক্‌ও হচ্ছে।

এ ছাড়া ইল্‌মে তরীকত প্রচার কার্যও সুষ্ঠুরূপে এই ইসালে ছওয়াব জলসারমাধ্যমে চলত। হযরত পীর সাহেব প্রত্যেক ফজর ও মাগ্‌রিবের নামাজ শেষে হাজার হাজার লোককে জিক্‌র মোরাকাবা ও শিক্ষা দিতেন। তাঁর খলিফারাও তা শিক্ষা দিতেন। হাজার হাজার প্রদীপ একস্থানে জ্বলন্ত অবস্থায় থাকলে যেমন আলো তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে, তেমনি হাজার হাজার তরীকতপন্থী কামেল জাকের ও হযরত পীর সাহেবের কামেল খলিফাদের আত্মার নূরে ইসালে ছওয়াবের মাঠ নূরান্বিত হয়ে উঠত। এ দৃশ্য কাশ্‌ফ শক্তির অধিকারী লোকদের

দৃষ্টিতেই ধরা পড়ত। হযরত পীর সাহেব এক নিস্‌বতে জামিয়ার ফয়েজে বহু সহস্র জাকেরকে এক সঙ্গে তরীকত ও মোরাকাবার তালিম দিতে পারতেন এবং দিতেনও।

তাঁর রুহানি জ্যোতির আকর্ষণে হাজার হাজার আশেক পতঙ্গের ন্যায় দূরদূরান্ত থেকে ফুরফুরায় এসে জমতো। গরীব মুরীদান সুদূর চট্টগ্রাম, আসাম অঞ্চল হতে পায়ে হেঁটে ফুরাফুরায় আসতেন। ইসালে ছওয়াবের জলসায় অসংখ্য বার কুরআন, কলেমা, দরূদ শরীফ খতম করা হয়ে থাকে। শেষরাত্রে এই সব খতম, যাবতীয় ওয়াজ-নসীহত, মিলাদ শরীফ পাঠ, লক্ষাধিক লোকের খাওয়া-দাওয়ার ছওয়াব, জিকির ফিকিরের ছওয়াব, দান-খয়রাতের ছওয়াব বখশিয়ে দেওয়া হয় হযরত নবী করীম (সঃ), তাঁর আওলাদ, আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত, আসহাব, সিদ্দিক, শহীদ, ইমাম, মুজতাহিদ, অলি-গউস-কুতুব, সমস্ত তরীকার পীর আওলিয়া, মোমিন মুসলমান, সমস্ত নবী-রসূল, জলসার হাজিরীন, সামেয়িন ও সহায়তাকারী লোকদের পূর্ব-পুরুষগণের রুহের উপর।[৪] এদিক থেকে এই ইসালে ছওয়াবের মহফিল-অনুষ্ঠানকে সার্থক অনুষ্ঠান বলা যায় এবং এর প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। কারণ মৃতদের আত্মা বা রুহের উপর ইসালে ছওয়াব করা উত্তম কার্য।

ফুরফুরার এই 'ইসালে ছওয়াব- মহফিলের তারিখ কারও জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ নয়। প্রতি বছর ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট করলে সুদূর বাংলা আসাম ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুরীদগণের পক্ষে তা জানা ও সময়-মাফিক উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। এজন্যই সাধারণ লোকের সুবিধার্থে প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের ২১। ২২ ২৩ তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মুহাজিরে মক্কী হাজী শাহসুফী ইমদাদুল্লাহ (রঃ) বলেছেন: "ইসালে-ছওয়াব জায়েজ, কোনো মোছলেহাতে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করাও জায়েজ।"

আমল-আখলাক-স্বভাব চরিত্র

'চরিত্র' বলতে আমরা বুঝি একটি লোকের প্রতিদিনের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, কাজ-কর্মাদির ধরন-ধারণ, চাল-চলন প্রভৃতি। তার দৈনন্দিন আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও কাজকর্ম ভালো হতে পারে, মন্দও হতে পারে। মন্দ আচার-আচরণকারী লোককে দুশ্চরিত্র লোক বলে, আর ভাল আচার-আচরণকারী লোককে সচ্চরিত্র বা চরিত্রবান লোক বলে। তাহলে স্বভাবচরিত্র হচ্ছে ব্যক্তির কার্যকলাপ ও আচার-আচরণ।

এই নিরিখে ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের আমল-আখলাক বিচার বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে, তিনি ছিলেন অতি উত্তম চরিত্রের লোক। তিনি অতি মিষ্টভাষী ও মিতভাষী ছিলেন। জীবনে কাউকে কোনদিন কটূকথা বলেন নি। ওয়াজ-নসীহতকালে তিনি এমন সুন্দর ও মিষ্টকথা বলতেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর বিবেচিত হতো। যাঁরা তাঁর ওয়াজ-নসীহত শুনত, তাদের হৃদয়পটে তাঁর কথাগুলো পাথর আঁকা নকশার ন্যায় অঙ্কিত হয়ে থাকত। কেউ যদি কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক করত, তিনি নরম মেজাজে মিষ্টিকথায় যুক্তি দিয়ে তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর যুক্তি ও মিষ্টিকথায় অবশেষে তর্ককারী ব্যক্তি খুশী হয়ে যেত এবং বিনয়সহ ত্রুটি স্বীকার করে তাঁর গুণমুগ্ধ মুরীদ হয়ে যেত।

হযরত পীর সাহেব কারও উপরে কোনদিনই রাগান্বিত হতেন না। তবে শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণকারী ব্যক্তির প্রতি কখনও রাগান্বিত হলেও সে ব্যক্তি হযরতের রাগ ধরতে পারত না। তিনি এমনভাবে, এমন ভাষায় কথা বলে তাঁর রাগ প্রকাশ করতেন যে, সে ব্যক্তি হাসিমুখে তা মেনে নিয়ে সংশোধিত হয়ে যেত।

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। কখনও কোনো কথা গর্ব বা দর্পসহ বলেন নি। মওলানা রুহুল আমিন লিখেছেন :

"কখন গরিমামূলক কোন কথা তাঁহার মুখে শ্রবণ করি নাই। কখন তিনি কোন মজলিশে ব্যক্তি বিশেষের নিন্দাবাদ করিতেন না। জৌনপুরের মওলানা হামেদ সাহেব তাঁহার উপর অযথা দোষারূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার বা জৌনপুরের খান্দানের কোন আলেমের উপর দোষারোপ করেন নাই। তিনি নিজেকে একজন সাধারণ লোকের তুল্য ধারণা করিতেন। নিজের নামের আগে حقير العباد। 'বান্দাগণের মধ্যে নিকৃষ্টতম' লিখিতেন। যদি তাঁহার কোন মুরিদ তাঁহার উচ্চ দরজা কাশ্‌ফ বা স্বপ্নযোগে অবগত হইয়া তাঁহার নিকট প্রকাশ করিত, তবে তিনি বলিতেন, ইহা তোমাদের ভাল ধারণা, নচেৎ আমি যাহা তাহা আমি জানি।

"কোন সৈয়দযাদা কিম্বা বোজর্গযাদা তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিতে আসিলে, তিনি সম্মানের সহিত তাঁকে তরিকতে দাখিল করিয়া অতি সত্বর খাস তাওয়াজ্জোহ প্রদান করতঃ শেষ দরজা পর্যন্ত পেঁছাইয়া দিতেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষদিগের সম্মানের জন্য তাঁহাদের দ্বারা খেদমত লইতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন।

"তিনি আলেমদিগের সম্মান করিতেন। ফুরফুরা শরীফে আলেমদিগের জন্য পৃথক শামিয়ানা স্থাপন করিতেন। আমি একজন নগণ্য খাদেম, যখনই তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি, পীর হইয়াও তিনি দাঁড়াইয়া যাইতেন। আর বলিতেন, আলেমের এলেমের সম্মান করা দরকার, আমি তাঁহার এই ব্যবহারে লজ্জিত হইতাম। ছোট বড়, ইতর-ভদ্র, উচ্চ-নীচ বলিয়া কোন তারতম্য করিতেন না। কোন শ্রেণীর হৃদয়ে আঘাত লাগে, এমন কোনো উপাধি ব্যবহার করিতেন না।

"তিনি 'ইছলাহোল মোয়াহ্‌হেদীন', কিতাবে বস্ত্রবয়নকারী শ্রেণীকে 'শেখ নুরবাফ্‌', মৎস্য ব্যবসায়ীকে 'শেখ ছোলায়মানী' ও তৈলকার সম্প্রদায়কে 'শেখ রওগন ফোরোশ' ইত্যাদি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ দেশস্থ উপাধিতে ডাকিলে তাহাদের অন্তরে আঘাত লাগিতে পারে।"[১]

---

১. হযরত পীর সাহেব কেবলার জীবনী : মওলানা রুহুল আমিন।

হযরত পীর সাহেবের সহ্য ও ধৈর্যগুণ ছিল অসীম। ছোটবড় যে কেউ ধর্ম ও শরীয়তের নিয়মকানুন সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি অম্লান বদনে তার জওয়াব ও ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। সহজে যদি কেউ কোন কিছু বুঝতে না পারত, তবে তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বারবার তাঁকে সে সম্পর্কে বোঝাতেন। তাতে একটুকুও বিরক্তি বোধ করতেন না। একই বিষয় নিয়ে যদি কেউ দু'বার কিংবা তিন বার তাঁকে প্রশ্ন করত, তবু তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তার প্রশ্নের উত্তর দিতেন। অপর কোন লোক যদি বারবার প্রশ্নকারী বারবার প্রশ্ন করার জন্য তিরস্কার করত তবে তিনি কিছুটা অসন্তুষ্টির ভাব দেখিয়ে সে ব্যক্তিকে বলতেন: "ঐ লোক তো আপনার কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করছে না, তবে আপনি কেন তাকে তিরস্কার করছেন? তার তৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করবো।"

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি সুস্থ অসুস্থ সকল অবস্থাতেই হাজার হাজার লোককে তরিকতের তালিম দিয়ে গেছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনো শিক্ষার্থীকেই তিনি কোনোরূপ অজুহাত দেখিয়ে তালিম প্রদানের অক্ষমতা প্রকাশ করে ফেরত দেন নি। সময়ে অসময়ে দেশ বিদেশের হাজারো লোক ফুরফুরা শরীফে ভিড় জমাতো। তিনি তাদেরে সাধ্যানুসারে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। কত লোক কত দিক্ দিয়ে কত ভাবে না তাঁকে বিরক্ত করত, কিন্তু সে সব তিনি হাসিমুখে সহ্য করতেন। সহ্যে ও ধৈর্যে তিনি ছিলেন পাহাড়ের মত অচল অটল। মানুষের ডাকে সাড়া দেবার জন্য, তরিকতের তা'লিম দানের জন্য প্রায় সময়ই তিনি সফরের কষ্ট সহ্য করেছেন।

তিনি ছিলেন ক্ষমাগুণের আঁধার। তাঁর ক্ষমাগুণের কথা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। 'মোহাম্মদী' সম্পাদক মওলানা আকরম খাঁ হযরত পীর সাহেবকে যে ভাবে ও যে ভাষায় এক সময় গালিগালাজ করেছিলেন, তা শুনলে যে কোন মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। কিন্তু মওলানা আকরম খাঁ যখন আবার তাঁর শরণাপন্ন হন—তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত সদয় ও ভদ্র ব্যবহার করলেন। তাঁর অতীত আচরণ ও সমস্ত রকমের বেয়াদবী ও অশিষ্ট ব্যবহার ভুলে গেলেন। মওলানা আকরম খাঁ তাঁর অমায়িক ও নিরহংকার ব্যবহারে এমন প্রীত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, পীর সাহেবের ইনতিকালের পর সংবাদপত্রে এক বিরাট প্রশংসামুখর বিবৃতি দিয়েছিলেন।

পাংশার 'খাতক' পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী নজিরউদ্দীন তাঁর পত্রিকায় ফুরফুরার ইসালে ছওয়াবের বিরুদ্ধে খুবই কুৎসা ও নিন্দাসূচক আলোচনা করেই যান। এজন্য তিনি নিজেও নিজের পরিবারস্থ লোকদের মহাবিপদ-গ্রস্থ দেখে হযরত পীর সাহেবের কাছে যেয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হযরত পীর সাহেবের কাছে যেয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হযরত পীর সাহেব তাঁকে হাসি মুখে ক্ষমা করে দেন এবং তাঁকে মুরীদ করে নেন।

তাঁর আত্মীয়-স্বজন কিংবা প্রতিবেশীদের কেউ তাঁর কোনো ক্ষতি করলে তিনি কখনও প্রতিশোধ নিতেন না। তাদেরও তিনি ক্ষমা করে দিতেন। একবার আইন পরিষদের নির্বাচন-বিষয়ে তিনি তাঁর সাহেবযাদা (পুত্র) মওলানা আবদুল কাদিরকে যশোর নিবাসী উকিল মৌলবী আবদুল আলীর সমর্থনের জন্য মনিরামপুর অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর (পীর সাহেবের) এক খাস মুরীদ পরোক্ষভাবে তাঁকে অপমান করেন। এতে তিনি মর্মাহত হন। পরে সেই খাস মুরীদ পীর সাহেবের কাছে যেয়ে এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ক্ষমা করে দেন। তাঁর কোনো মুরিদ মহা অপরাধ করলেও তিনি ক্ষমা করে দিতেন।

হযরত পীর সাহেব একজন বড় দাতাও ছিলেন। তাঁর সাখাওয়াতির কথা বর্ণনা করা যায় না। কত লোককে যে কতভাবে তিনি দান-খয়রাত করেছেন তার কোনো হিসাব-নিকাশ নেই। তাঁর দানকার্য সম্পাদিত হত অতি গোপনে। বহু দরিদ্র প্রতিবেশী, বিধবা, এতিম তাঁর কাছ থেকে দান খয়রাত পেয়ে ধন্য হয়ে গেছে। তিনি দরিদ্র বিধবাদের তত্ত্বাবধান করেছেন, এতিম বালক-বালিকাদের প্রতিপালন করেছেন। ইসালে ছওয়াবের সময় বহু দরিদ্র লোককে সাহায্য করেছেন। তাঁর নিজ বাড়ীতেই তিনি ১৭।১৮ জন ছাত্রকে রীতিমত জায়গীর রাখতেন। মাদ্রাসার ঘাটতি তহবিল তিনি নিজের তহবিল থেকে পূর্ণ করে দিয়েছেন। নিজের পকেট থেকে তিনি বহু কপর্দকহীন লোকের পাথেয় দিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর জমিদারীতে যাতে প্রজাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার না হয় সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। সকল প্রজাকেই তিনি আপন সন্তান তুল্য মনে করতেন। কোনো প্রজার পাঁচ বছরের খাজনা বাকী পড়লে—দু'এক বছরের খাজনা দিয়ে বাকী খাজনা মাফ চাইলে মাফ করে দিতেন।

কোনো লোক বিপদে পড়ে পীর সাহেবের দ্বারস্থ হলে তিনি তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করতেন, নানাভাবে তাকে সাহায্য করতেন।

কেউ কোনো চাকুরি, জায়গীর, মসজিদ ও মাদ্রাসার সাহায্যের জন্য তাঁর সুপারিশ-পত্র নিতে আসলে তিনি কোনরূপ ওজর আপত্তি না করে তাতে দস্তখত দিয়ে দিতেন। অন্যায়ভাবে কোন লোক কোর্টে অভিযুক্ত হলে, তিনি তার পক্ষে তদবীর ও দোওয়া-খায়ের করে তাকে পরিতৃপ্ত করতেন।

তিনি কোথাও গেলে এবং সেখানে কোন বুযর্গ বা পীর-আউলিয়ার মাজারের কথা জানতে বা শুনতে পেলে সেই মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে হাজির হতেন ও মাজার জিয়ারত করে আসতেন। কোনো গোরস্তানের কাছ দিয়ে গেলে সমস্ত গোরবাসীদের জন্য তিনি দোয়া করে আসতেন। মাজার বা গোরস্তানের খাদেমেরা কোনো বেদআতী কার্য করলে তাকে সে বেদয়াত থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করতেন।

হযরত নবী করীম (সা:) এর দরবারে কোনো দারোয়ান থাকত না। যে কোনো লোক সেখানে যেয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারত। ফুরফুরার পীর সাহেব দরবারে কোন দারোয়ান রাখতেন না। যে কোনো লোক যে কোন সময় দরবারে যেয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারত। ছোটবড় সকল লোকই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাদের মনের একথা অকপটে তাঁর কাছে প্রকাশ করতে পারত।

হযরত পীর সাহেবের সঙ্গে কেউ মোসাফা করতে চাইলে, তিনি আনন্দ সহকারে তার সঙ্গে মোসাফা করতেন। সমাগত আলেমদের মান-সম্ভ্রমের প্রতি তিনি যেরূপ দৃষ্টি রাখতেন, সেইরূপ অন্যান্য লোকদের প্রাপ্য যোগ্য মর্যাদার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। আমির, মহাজন, জমিদার, তালুকদার শ্রেণীর লোকদের মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি যেমন নজর রাখতেন, গরীব-মিসকীনদের প্রতিও তাঁর সেই নজর ও অনুগ্রহ বজায় থাকত।

অন্যান্য পীরেরা যে আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিচ্ছদ পরতেন, তিনি তার ধারে কাছেও যেতেন না। হযরত মওলানা রুহুল আমিন লিখেছেন : তিনি (হযরত পীর সাহেব) সূতী কিম্বা পশমি লম্বা পিরহান ব্যবহার করিতেন। আচকান ব্যবহার করিতে তাঁহাকে দেখি নাই। পিরহানে মুণ্ডি ব্যবহার করিতেন। লম্বা পিরহানের নীচে নিম আস্তিন কোরতা ব্যবহার করিতেন। কখন পায়জামা, কখন তহবন্দ ব্যবহার করিতেন। তাঁর প্রস্রাব-পায়খানার তহবন্দ আলাহিদা, নামাজের তহবন্দ আলাহিদা ছিল। মস্তকে আরবী টুপী, পায়ে সলীমশাহী জুতা ব্যবহার করিতেন। একখানা

রুমাল ব্যবহার করিতেন। নামাজে পাগড়ী ব্যবহার করিতেন। অন্যান্য সময়ে দৈবাত পাগড়ী ব্যবহার করিতেন। অনেক ক্ষেত্রে কেবল টুপী ব্যবহার করিতেন। দৈবাত আবা চোগা ব্যবহার করিতেন। হযরত পীর সাহেব বলিয়াছেন: বাবা, উহা ব্যবহারে গরিমা হয়, এই হেতু উহার ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছি। তিনি খ্রীষ্টান, হিন্দু ও শিয়াদের পোশাক ব্যবহার করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিতেন।"[২]

হযরত পীর সাহেবের আহার্য-বস্তু কী ছিল এবং তিনি প্রতিদিন কি কি জিনিস আহার করতেন সে সম্পর্কেও মওলানা রুহুল আমিন লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন: "হযরত পীর সাহেব অধিকাংশ সময় চাউলের ভাত খাইতেন, হালওয়া, গোশত, মৎস্য ও ঘৃত ব্যবহার করিতেন, যখন যাহা সুযোগ হইত তাহাই খাইতেন। যদি কোন তরকারী লঙ্কা, ঝাল ইত্যাদির জন্য খাওয়ার অযোগ্য হইত, তবে উহার দুর্নাম না করিয়া খাওয়া ত্যাগ করিতেন। খাদ্য-সামগ্রীর অবশিষ্টাংশ উহার মালিকের অনুমতি লইয়া সঙ্গীদিগকে দিতেন।

"তিনি গরম দুধ মিসরিসহ পান করিতেন। মুর্গী ও বকরির গোশত অধিকাংশ সময় ভক্ষণ করিতেন। দৈবাত গো-গোশত ভক্ষণ করিতেন।"[৩]

শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য না খেলে স্বাস্থ্য ঠিক রাখা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য আহারে বিরোধী ছিলেন না, বরং এর পক্ষে মত পোষণ করতেন। "অত্যধিক সংসার বৈরাগ্য এবং সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য বর্জন অন্তর ও মস্তিষ্কের দুর্বলতা সৃষ্টি করে।" তাই তিনি তাঁর মুরীদানদের এ সব উপাদেয় খাদ্য গ্রহণে উৎসাহ দিতেন।

"হযরত পীর সাহেব ফজরের নামাজের পর নিজে জিকির, মোরাকাবা, মোশাহেদা শেষ করে জাকেরিনদের মোরাকাবা-মোশাহেদার তা'লিম দান করতেন, তাওয়াজ্জোহ-তা'লিমও দিতেন। ইশরাকের নামাজের পরও জাকেরদের আবার তা'লিম দান করতেন। তিনি ইশরাকের নামাজ কোনো সময় দুই রাকাত, কোনো সময় চার রাকাত পড়তেন। তারপর চাশ্‌তের নামাজ। কোনো সময় ছয় রাকাত, আবার কোনো

২. হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী : মওলানা রুহুল আমিন (র:)
৩. " " ঐ ঐ

সময় আট রাকাত পড়তেন। চাশ্‌তের নামাজ পড়ে তিনি সামান্য কিছু আহার করতেন। এরপর একটু শুতেন। এই শোওয়া সুন্নতের পায়রবী মোতাবেক হতো। তিনি জোহরের নামাজ ঠিক আউওয়াল ওয়াক্তে পড়তেন। কোনো সময় ইশরাক নামাজ পড়ে, কখনো বা জোহরের নামাজ পড়ে তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতেন। জোহরের নামাজের পরে অনেক সময় মাদ্রাসার দিকেও যেতেন। প্রায় সময়ই জোহর থেকে মাগরিব-এশা পর্যন্ত তরিকতের সালেকদেরে সলুকের তা'লিম দান করতেন। মাঝে মাঝে কুরআনের হাফেজদেরে ডেকে এনে তাদের কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করতেন। হাফেজদের কুরআন পাঠের সময়ে তিনি অনেক সময় আবেগে অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন, কখনও কেঁদে উঠতেন। আবার কখনও তাঁর মুখ থেকে আল্লাহ্ শব্দ বের হয়ে আসত। তাঁর এ অবস্থা দর্শনে তরিকতপন্থীগণ আত্মহারা হয়ে পড়তেন। এশার নামাজান্তে বাড়ী মধ্যে, কখনও বা হোজরা শরীফে বিশ্রাম করতেন। অনেক সময় রাত্রিতে তাহাজ্জদ নামাজান্তে দরূদ শরীফ পড়তে পড়তে ফজর করতেন।

বাংলা ও আসামের মুসলমানদের মধ্যেও সেকালে একটা ধারণা বদ্ধ-মূল ছিল যে, শরীফোন্নসব না হলে কোনো লোক ইমাম বা পীর হতে পারে না। মওলানা রুহুল আমিন লিখেছেন: হযরত পীর সাহেব বলিতেন, বাবা, আবু বকরের ইচ্ছা প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে এমনকি মেহতরের সূত্র পীর হউক। তিনি কার্যে তাহাই করিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহার চেষ্টায় সর্বশ্রেণীর আলেমগণ অবাধে ইমাম হইতেছেন। সমস্ত শ্রেণীর আলেমদিগকে শিক্ষা দিয়া পীর বানাইয়া তিনি খেলাফত-নামা দিয়া গিয়াছেন।"[৪] মওলানা রুহুল আমিন (রঃ) আরও লিখেছেন: "হযরত পীর সাহেব একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, বাবা, মূল শরীফো ন্নসব অল্পই ছিল। যাহাদের রীতি-নীতি শরীয়ত মোয়াফেক, আমরা তাহাদের সহিত বিবাহ-শাদী প্রথা প্রবর্তন করিয়া শরীফ বানাইয়া লইয়াছি। আমি জানি, হযরত পীর সাহেব নিজের আত্মীয় একটি স্ত্রীলোকের বিবাহ এরূপ লোকের সহিত করাইয়া দিতে প্রস্তাব করেন যে সে তাঁহাদের কুফু নহে।"

---

৪. হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী: মওলানা রুহুল আমীন (রঃ)
৫. ঐ ঐ ঐ

স্বয়ং হযরত পীর সাহেব বাংলা ও আসামের লোকদের মধ্যে সখ্য ভাব প্রতিষ্ঠাকল্পে গয়র কুফু বিবাহ করতে ইতস্ততঃ করেননি। তাঁর এই কার্যে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এই শরীফোন্নসবের ধারণার সামাজিক বন্ধন অনেকটা শিথিল হয়ে গিয়েছে। তাঁরই প্রেরণায় বহু উচ্চ শিক্ষিত লোকও গায়র কুফু বিবাহ আদান-প্রদান করেছেন। ফলে অনেক স্থানে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফুরফুরার ইসালে ছওয়াবের মহফিলের অছিলাতেও সামাজিক অসাম্য অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে। সব শ্রেণীর লোক ইসালে ছওয়াব উপলক্ষে একত্রে পানাহার করে থাকেন। সকল শ্রেণীর পীরভাইদের মধ্যে একত্র মেলামিশা ও খাওয়া-দাওয়ার মাধ্যমে সহোদর ভাইদের চেয়েও বেশী প্রীতি-মহব্বত প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। হযরত পীর সাহেব এইভাবে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক হয়ে বাংলা ও আসামের মুসলমানদের অসাম্য ও অনৈক্য দূর করেছেন।

অছিয়তনামা

হযরৎ পীর সাহেব তাঁর মুরীদান ও দেশবাসী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে যে অছিয়তনামা লিখে রেখে গেছেন এখানে আমরা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য তা হুবহু উদ্‌ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন ঃ

আস্‌সালামু আলাইকুম—

বাদ আমার অনুরোধ ও উপদেশ এই যে, আমার খলিফা মুরীদান ও কুলঈমানদার মোছলমান ভাইদিগের নিকট নিম্নলিখিত মনোভাব প্রকাশ করিলাম। সকলে যথাশক্তি আমল করিবেন। হায়াত কাহারও কায়েম নহে। كل نفس ذائقة الموت কুল্লো নাফ্‌ছেন জায়েকাতুল মাউত।

আমি বৃদ্ধ অবস্থায় পরিণত হইয়াছি, কোন্ সময় ইহ দুনিয়া ছাড়িয়া যাইতে হয় তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমার ভয় হয় আমার খলিফা, মুরীদগণ ও মোতাকেদগণ শরীয়ত অনুযায়ী আমার মতের কোনো বিরুদ্ধ মত আমল করিয়া গোমরাহ হইয়া যায়। স্থানে স্থানে দেখা যায় শরীয়ত অনুযায়ী আমলকারী পীরের খলিফা ও মুরীদ পীরের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এক একজন এক একদল তৈয়ার করিয়া সাধারণ মুসলমান ভাইদিগকে গোমরাহ করিতেছে। যাহা হউক, আমার আছিয়ত নামাখানি আমল করিলে আমি বিশেষ খুশী হইব। যেহেতু হাদীস শরীফে আছে الدال على الخير كفاعله—আদ্‌দালুলো আলাল খায়রে কাফায়েলিহি—যিনি নেক কাজের পথ দেখাইয়া দেন, তিনি ঐ নেক্‌কারের সমান সওয়াব লাভ করিবেন। তাই অনুরোধ, আমি যেনো মৃত্যুর পরও কিছু নেকি পাইতে পারি।

অছিয়ত

(১) বর্তমান সময়ে ঈমান বাঁচাইয়া রাখা খুব সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে। আশরাফুল মখ্লুকাত খাতেমুন নাবিয়ীন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম শেষনবী, তাঁহার পর আর নবী হইবে না। ইঁহার উপর ঈমান কায়েম রাখিবেন। কালেমা তাইয়েবা,—لا اله الا الله محمد رسول الله লাইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ, আল্লার ব্যতীত কেহই মা'বুদ নাই, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) আল্লাহ্ রসূল। কালেমা শাহাদত,—اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু, ওয়া আশ্হাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু—আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই মাবূদ নাই, তিনি অদ্বিতীয় অংশীবিহীন, আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-আল্লাহর বান্দাও রাসূল। ইঁহার উপর ঈমান কায়েম রাখিবেন। ইহঁার বিপরীত কোন কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। যদি কেহ উক্ত কলেমাসমূহ পরিবর্তন করে, সে বেঈমান ও কাফের হইয়া যাইবে।

(২) জীবিত কি মৃত পীরের সুরাত হাজের নাজের জানিয়া ধ্যান করা হারাম, যাহারা করে তাহারা বেঈমান।

(৩) পুত্র কন্যাদিগকে দ্বীনি এলেম শিক্ষা দিবেন তৎসঙ্গে দুনিয়ার যাবতীয় বৈধ হুনর (কৌশল, গুণ) হেকমত (শিল্প) ও ভাষা—ইংরাজী বাংলা ইত্যাদি শিক্ষা দিবেন ও যাহাতে সর্বসাধারণে শিক্ষিত হইতে পারে তজ্জন্য ইসলামিক কলেজ, ইসলামিয়া মাদ্রাসা, জুনিয়ার সিনিয়ার মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদি ও মধ্যে মধ্যে দুই একটি হাদীছ তফছিরের দাওরা খুলিয়া হাদীছ তফছির পড়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন এবং পাক কুরআন শরীফ তাজবিদ অনুযায়ী যাহাতে পড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

(৪) স্ত্রী, কন্যা, মা ভগ্নীদিগকে পর্দায় রাখিবেন। কন্যাদিগকে শিক্ষা দানকালেও পর্দায় রাখিয়া স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী বা মহরম ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষা দিবেন। যাহারা স্ত্রী, কন্যা, মা ও ভগ্নীকে বেপর্দায় রাখিবে, তাহারা দাইয়ুছ হইয়া জাহান্নামে যাইবে। পর্দা করা ফরজে আয়েন। ইহার প্রতি যাহারা ঘৃণা করিবে, তাহারা বে-ঈমান। উহাদের মতের উপর ধিক্কার দিবেন।

(৫) আমার মতে যাবতীয় চাকুরীর উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা করায় বাধা নাই। যে চাকুরী শরীয়ত অনুযায়ী জায়েজ, তাহা করিবেন, কিন্তু হালাল উপার্জন ও সুন্নত মোতাবেক পোশাক ইত্যাদি ও রোজা নামাজ ঈমান ঠিক রাখিয়া করিবেন।

(৬) সুদ খাওয়া হারাম, কম হউক কি বেশী হউক, বিশেষ ওজর ব্যতীত সুদ দেওয়াও হারাম। সুদ দেওয়া ও সুদ খাওয়া একই প্রকার গোনাহ্। সুদের টাকা আনিয়া কারবারও করিতে নাই। সুদখোরের দাওয়াত খাওয়া, তাহার দান খয়রাত গ্রহণ করা হারাম। যে সুদের মাল খাইবে, তাহার কল্‌ব অন্ধকার হইয়া যাইবে। সে জেক্‌রের আস্বাদ পাইবে না। সুদখোর তওবা করিলেও তাহার বাড়ীতে বৎসর কাল মধ্যে খাইতে নাই। যদি কোন সুদখোর তওবা করিয়া সুদের সমস্ত মাল ফেরত দেয়, তবে তাহার বাড়ীতে তৎক্ষণাত খাইতে পারে। আর তওবা করিয়া সুদ ফেরত না দিলে, তাহাকে বৎসরকাল পর্যন্ত দেখিতে হইবে, সে সুদ হইতে পরহেজ করে কি না। যদি সুদ আর না খায় ও তাহার মাল অর্ধেকের বেশী হালাল থাকে, এক্ষেত্রে যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, হালাল মাল দ্বারা খাওয়াইবে, তবে তাহার দাওয়াত খাওয়া জায়েজ হইবে। সুদখোরের পৌণে ষোল আনা হালাল মাল থাকিলেও তওবা করিয়া ইস্তেকামত (সোজা দাঁড়ান) না করা পর্যন্ত তাহার বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া জায়েজ নহে, যেহেতু সেও ফাঁসেকে মো'লেন (প্রকাশ্য ফাসেক)। সুদখোরকে তওবা করান মাত্রই তাহার বাড়ীতে খাইলে ও খয়রাত লইলে, হেদায়েত হওয়া দূরের কথা বরং সুদখোরের দাওয়াত খায় ও খয়রাত লয়, সে যেন আমার মুরিদ বা খলিফা বলিয়া পরিচয় না দেয়। তাহার নিকট কেহ মুরীদ হইবেন না।

(৭) মেয়ের সাচকের (পণের) টাকা খাইবেন না। যে ব্যক্তি খাইবে ও তদ্দারা জেয়াফত করিবে, তাহা হারাম। এই জেয়ারত যাহারা খাইবে, তাহাদের হারাম খাওয়ার গোনাহ্ হইবে। আমার খলিফাদের মধ্যে যদি কেহ সুদখোরের বাড়ী কিম্বা মেয়ের পণের টাকা দ্বারা জেয়াফতকারী ও গ্রহণকারী বাড়ীতে খায়, তাহার নিকট কেহ মুরিদ হইবেন না। এইরূপ ব্যক্তি আমার খলিফা হউক অথবা অন্য পীরের খলিফা হউক, তাহাদের নিকট মুরীদ হইবেন না।

(৮) ভাই ভগ্নী ও অংশীদারগণের অংশ ফারায়েজ অনুযায়ী ভাগ করিয়া দিবেন। যদি তাহাদিগকে দেওয়া অসম্ভব হয়, তবে উহার মূল্য দিয়া হউক, বা যে কোন প্রকারে হউক সন্তুষ্ট করিয়া দাবী ছাড়াইয়া লইবে না নচেত খোদার নিকট দায়ী থাকিবে। টাকার হউক, কথার হউক, দাবীদারের নিকট মাফ লইবে। যদি দাবীদার মৃত্যুগ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে টাকা পয়সা তাহার ওয়ারিশগণকে দিবে। কথা ইত্যাদি মাফের জন্য নামাজ পড়িয়া সেই মৃতের রুহের উপর ছওয়াব রেছানি করিবে। আর খোদার নিকট ক্ষমা চাহিবে। প্রথম বিবাহ ও দ্বিতীয় বিবাহের পুত্রকন্যাদের অংশের মধ্যে ফারায়েজ অপেক্ষা কম বেশী করিয়া দিলে, খোদার নিকট দায়ী থাকিবে।

(৯) আমি যে কাদেরীয়া, চিশ্‌তিয়া, নক্‌শেবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকা সম্বন্ধে সবক ও তালিম দিয়া থাকি ও দিয়াছি, সেই মোতাবেক সকলে কায়েম থাকিবেন। উহা হযরত পীরনে পীর শাহ আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) সাহেবের ও মওলানা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলবী (রঃ) এর কেতাব অনুযায়ী করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত মওলানা শাহ কারামত আলী মরহুম মগফুর সাহেবের মারেফাতের কেতাবগুলি সকলে সর্বদা দেখিতে থাকিবেন। তিনি আমার দাদাপীর হযরত মওলানা শাহ নূর মোহাম্মদ মরহুম মগফুর সাহেবের পীর ভাই ছিলেন। অতএব আমরা এক তরিকাভুক্ত।

(১০) আমার খলিফা ও মুরীদদের মধ্যে যদি কেহ কুরআন হাদীস ও ফেকাহসমূহের বিপরীত অর্থাৎ শরীয়তের বিপরীত কোন মত প্রকাশ করে, তবে তাহা কেহ মানিবেন না। যদি কেহ আমার খলিফা ও মুরীদ দাবী করিয়া আমার অছিয়তের বিপরীত চলে, তবে কেহ তাহাকে আমার মুরীদ বা খলিফা মনে করিবেন না ও তাহার নিকট মুরীদ হইবেন না।

(১১) হিন্দুর পূজা পার্বণে, মেলা, বিহারে ও গান বাজনার স্থানে সাহায্য করিবেন না ও উহাতে যাইবেন না। পূজায় পাঁঠা, কলা, ইক্ষু দুধ ইত্যাদি বিক্রয় করিবেন না। ভেট দিবেন না। দিলে গোনাহ্ কবীরা হইবে।

(১২) কেহ প্রকাশ্যে ফাসেকের দাওয়াত কবুল করিবেন না এবং তাহাকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইবেন না; যথা—বেনামাজী, কেননা প্রত্যহ বেতরের নামাজে পড়া হয়, 'ওয়ানাত রোকু মাই ইয়াফ্‌জারোকা' আমরা ফাছেক ফাজেরের সহিত চলিব না।

(১৩) কেহ দাড়িমুণ্ডন করিবেন না, এক মুষ্টির কম হয় এমত খাট করিবেন না, লম্বা মোচ রাখিবেন না। ফ্রান্সকাট, টেরি বা চাকাইয়া ছাঁট ছাঁটিবেন না। কাছা দিয়া কাপড় পরিবেন না। কোট পেন্ট নেকটাই ইত্যাদি বিজাতীয় পোশাক ব্যবহার করিবেন না। সুন্নত মোতাবেক পোশাক লইবেন ও খালি মাথায় চলিবেন না। টুপী, পাগড়ী লুঙ্গী পায়জামা ও লম্বা কোরতা ব্যবহার করিবেন। আচকান, চোগা ইত্যাদি মোবাহ পোশাক ব্যবহার করাও জায়েজ। বড়ই পরিতাপের বিষয়: নাছারা হিন্দু ও অন্যান্য গায়ের কওম তাহাদের জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করে না। আর আমাদের কওমের কতক লোক বর্তমানে যাত্রার সঙ সাজিতে লজ্জা বোধ করে না। কখন দাড়ি মুণ্ডন করে, হ্যাট পরে, খালি মাথায় কাছা দিয়া রাস্তায় বেড়ায়, কখন টুপী মাথায় দিয়া লুঙ্গী পরিয়া থাকে। আমি দোওয়া করি, আল্লাহ্, আমার মুসলমান ভাইদের ঈমান কায়েম রাখেন ও শরীয়তের খেলাফ পোশাক হইতে রক্ষা করেন।

(১৪) তাস, পাশা খেলবে না। ঘোড় দৌড়, মহিষ ও গরুর লড়াই বা কোন প্রাণীর লড়াই খেলার নিয়তে দিবেন না ও করিবেন না। যদি কোথাও ঐরূপ লড়াই হয়, তথায় যাইবেন না, উহা হারাম। আত্ম-রক্ষার জন্য ঘোড় দৌড়, লাঠি খেলা শিক্ষা, তলোয়ারভাজা, তীরন্দাজী শিক্ষা মাসের মধ্যে দুই তিন দিন তালিমের জন্য করা জায়েজ হইবে, কিন্তু হাঁটুর নীচে পর্যন্ত পায়জামা পরিবে, নামাজের ওয়াক্তে নামাজ পড়িবে, ঐ শিক্ষাকালে বাজী ও বাজনা না রাখিয়া শিক্ষা করা জায়েজ আছে। কিন্তু ঈদ, বক্‌রাঈদ, শবে বরাত, মহরম ইত্যাদিতে যেন না করে, করিলে ইবাদতের ক্ষতি হইবে।

(১৫) বিবাহে বারুদ পোড়ান, লাঠিখেলা, কলের গান, সুর দিয়া পুঁথি পড়া ইত্যাদি কার্য করিবেন না। ফজুলভাবে অর্থ ব্যয় করিবেন না, উহা হারাম।

(১৬) যথাশক্তি ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি শিল্প কার্য ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া হালাল উপার্জন করিবে। খয়রাত গ্রহণ করার উপর নির্ভর করিবে না। শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্যের নিকট খয়রাত চাহিয়া লওয়া হারাম। আলেমের এলেম, পীরের পীরত্ব যেন খয়রাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে না হয়। আলেম ও পীরগণ আল্লার ওয়াস্তে ওয়াজ নছিহত করিবেন।

কাহার নিকট ইশারা বা ইঙ্গিত দ্বারা অথবা অন্যের সাহায্যে খয়রাত আদায় করিবেন না, উহাও হারাম। যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া দেন, তবে লওয়া জায়েজ আছে।

(১৭) আলেম সাহেবদের নিকট আমার বিনীত আরজ এই যে, আপনাদের মধ্যে যদি কোন মছলা লইয়া এখতেলাফ বা মতভেদ হয়, তবে একত্রে বসিয়া কেতাবসমূহ লইয়া মতভেদ মীমাংসা করিয়া সর্বসাধারণের নিকট ছহিহ মত প্রকাশ করিবেন। যাবৎ ঐরূপ আলেম সাহেবদের একতা না হইবে, তাবৎ আলেম সমাজে দলাদলি থাকিলে অচিরে সমাজ বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে।

(১৮) যদি কোন আলেমের মত কোনরূপ কিতাবের খেলাফ বিজ্ঞাপনে বা বাজে লোকের মুখে দেখিতে ও শুনিতে পান তবে যতক্ষণ নিজে তাহার লিখিত মত বলিয়া কিম্বা তাহার মৌখিক কথা বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার উপর কোন প্রকার ইশতেহার ও ফতওয়া প্রকাশ করিবেন না। অনেক স্থানে অনেক বাজে লোকের কথা বিশ্বাস করিয়া ভাল লোকের উপর ফতওয়া ও ইশতেহার প্রকাশ করিয়া বহু সংখ্যক ঈমানদার মুছলমানের ঈমান বিনষ্ট করিয়া মহা গোনাহগার হইয়াছে ও হইতেছে।

আলেম ও পীর সাহেবগণ সাবধান থাকিবেন। শয়তান জীবিত আছে। সে পীরে পীরে ও আলমে আলেমে বিবাদ ও দলাদলি লাগাইয়া ইছলামকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে। আল্লাহ্ পানা দিন।

(১৯) কেহ গান বাজনা করিবেন না ও শুনিবেন না। আল্লাহ্ ও রসূলের তা'রিফ কবিতা গজলে পড়িতে পারে, কিন্তু ইল্‌মে অরুজির ওজনে পড়িবে, ইল্‌মে মুছিকির ওজনে অর্থাৎ রাগ-রাগিণী সহকারে পড়া হারাম। ইলমে অরুজির সহিত পড়িতে হইলে পাঁচটি শর্ত পালন করিতে হইবে—যথা, মেয়ে লোক মজলিশে যেন না থাকে।

(২০) বর্তমানে যে বাজে লোক মসনবী শরীফ ইলমে মুছিকির ওজনে অর্থাৎ রাগ-রাগিণী সহকারে পড়িয়া থাকেন, ইহা জায়েজ নাই, তথায় যাইবেন না। যদি কেহ তথায় যাইয়া থাকেন, তবে তথা হইতে উঠিয়া যাইবেন। মসনবী শরীফ ইলমে অরুজির সহিত অর্থাৎ বিনা রাগরাগিণীতে মিষ্টস্বরে পড়িতে বাধা নাই।

(২১) মাথায় এইরূপ লম্বা চুল রাখিবেন না যে তাহা মেয়ে লোকের ন্যায় হয়। বাবরী সুন্নত মোতাবেক রাখিতে পারেন। বাজে নাদান ফকিরেরা লম্বাচুল রাখে—উহা হারাম। বাবরী রাখিতে হইলে স্কন্ধ পর্যন্ত চুল কাটিয়া ঘাট রাখিবেন, মহাড়ার নীচে যেন না পড়ে। মহাড়ার নীচে চুল লম্বা হইলে স্ত্রীলোকের ন্যায় হয়। উহা হারাম। উহার প্রতি খোদা তা'আলার লা'নত পতিত হইবে।

(২) সওয়াব রেছানি করিয়া, কেহ সওয়াল করিয়া কিছু লইবেন না, উহা হারাম। যদি কেহ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মৃতের খতম পড়ে, আর পড়ানেওয়ালা লিল্লাহ কিছু দেয়, এক্ষেত্রে লওয়া দেওয়া জায়েজ আছে। বর্তমান জামানায় কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ শিক্ষা দিয়া, আজান দিয়া, ইমামতি করিয়া, খত্‌মে তারাবী পড়িয়া ও ঝাড়ফুঁক দিয়া মজুরী লওয়াজ ায়েজ আছে।

(২৩) ওয়াজ নসিহত আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করিবেন। কি লিল্লাহ দিলে লওয়া জায়েজ আছে। বাজে স্থানের লোকেরা ভালমন্দ, সুদখোর, ঘুষখোর ইত্যাদির চাঁদা জমা করিয়া ওয়াজকারীদিগকে দেয় উহা না-জায়েজ। হালাল মাল দিয়া দিলে লইতে দোষ নাই।

(২৪) যে যে স্থানে থাকেন, জামায়াতে নামাজ পড়িবেন। জুমা ও ঈদ পড়িবেন। মক্কাশরীফ ও মদীনা শরীফ ব্যতীত সকল স্থানে আখেরী জোহরের নামাজ পড়িবেন। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তিন জুমা তরক করিবে, সে ব্যক্তি মালাউন।

(২৫) অনেক স্থানে দেখা যায়, পীরের ছেলে কিছু জানুক বা না জানুক পীর সাজিয়া বসে ও মুরীদ করিতে থাকে। অন্য কোন ভাল পীরের নিকট সাধারণকে যাইতে নিষেধ করে। আমার ভয় হয়, আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্রদের মধ্যে ঐরূপ হইয়া পড়ে নাকি। অতএব আমার পুত্রদের মধ্যে যাহারা শরীয়ত মোতাবেক আমল করিবে ও চলিবে এবং তালিম ও শিক্ষা দিবে, তাহাদের অনুসরণ করিবেন।

(২৬) আমার বাড়ীতে বৎসরের ২১।২২।২৩শে ফাল্গুন তারিখ নির্ধারিত করিয়া একটি ওয়াজের মজলিশ করি। ঐ তারিখে আমার পীর কিম্বা দাদা পীরের মৃত্যু হয় নাই। আমি জানি আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন ঃ

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا 'হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজদিগকে ও নিজেদের পরিজনকে অগ্নি হইতে রক্ষা কর।' এই আয়াতের মর্ম অবলম্বনে আমার বাড়ীতে দেশী বিদেশী সকলকে আম দাওয়াত দিয়ে বহু আলেম, ওলামা, হাফেজ, ক্বারী কর্তৃক ওয়াজ নছিহত করাইয়া ও নিজে করিয়া শরীয়তের হুকুম আহকাম জানাইয়া দেই। যদি কোন দেশে কোন মছলা লইয়া মতভেদ থাকে, তবে এই মহফিলে থাকিয়া ইহার মীমাংসা করিয়া লন।

এই মহফিলে প্রায় প্রত্যহ ২৪।৩০ হাজার লোক হাজের থাকে। ঐ তিন দিনের একদিন ৬০।৭০ খতম কুরআন শরীফ, সূরা ইখলাছ ও ও ফাতেহা কালেমা ইত্যাদি পড়ান হয়। এই সমস্তের সওয়াব হযরত নবী (ছাঃ) এর ও যাবতীয় অলি-আওলিয়া, গওছ-কুতুব ও যাবতীয় মুসলমানের রুহের উপর (সওয়াব) রেছানি করা হয়। এই জন্য এই মহফিলের এক নাম ইসালে সওয়াব। যদি কেহ এই মহফিলকে প্রচলিত ওরোছ বা অন্য কিছু বলে, তবে তাহা কেহ শুনিবেন না। এই মহফিল যাহাতে আল্লাহ্ কায়েম রাখেন তাহার চেষ্টা আমার পুত্রগণ খলিফাগণ ও মুরিদগণ করিবেন।

খলিফাগণের মধ্যে যদি কাহার বাড়ীতে এইরূপ মহফিল করিবার কাহারও শক্তি হয়, তবে তিনি তাহা করিবেন। সাবধান, কেহ যেন অর্থের লোভে বা অন্য কোন রূপ মান-মর্যাদার জন্য না করেন। বিশুদ্ধ হেদায়েতের নিয়তে করিলে বহু নেকী পাইবেন। আরও সাবধান থাকিবেন যে, যেন এই মহফিলে কোন প্রকার বেদয়াত ও হারাম কার্য বা নামাজের জামায়াত তরক না হয়। বাজে তামাসা ইত্যাদি না হয়। যদি কেহ উহা করে, তবে আমি তাহার প্রতি দাবী রাখিব।

(২৭) বাজে পীরের দরবারে অমাবস্যা পূর্ণিমা বা পীরের মৃত্যুর তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া 'ওরছ' ইত্যাদি হইয়া থাকে। এমন কি জামায়াতে নামাজ পড়া হয় না, ওখানে মেয়ে লোক যায়, তাহারা হালকাকরে ও বেপর্দা চলে—উহা হারাম। ঐরূপ মজলিশে কেহ যাইবেন না, যে রূপ সুরেশ্বর, মাইজভাণ্ডার ইত্যাদি স্থানে আছে। ঐভাবের 'ওরছ' বেদয়াত ও হারাম।

(২৮) এমন জলি জিক্‌র করিবেন না যাহাতে নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয়, কুরআন শরীফ ও নামাজ পড়ায় বিঘ্ন ঘটে।

(২৯) 'জোয়াজ্জিন' ও 'দোয়াজ্জিন' সম্বন্ধে যে স্থানে স্থানে মতভেদ আছে, তৎসম্বন্ধে আমার মত এই যে, মক্কাশরীফ ও মদীনা শরীফের মোহাক্কেক আলেমগণ যেরূপ 'দোয়াজ্জিন' পড়ে, আমিও তদ্রূপ পাড়িন দান, জাল দ্বারা পড়িলে নামাজে, ফতুরি আসিবে, কিন্তু যে ব্যক্তির চেষ্টা করা সত্ত্বেও মখরেজ আদায় না হয়, তাহার জন্য মাফ।

(৩০) কেহ জমি কট রাখিবেন না, জায়সুদী ইত্যাদি দ্বারা কেহ সুদ খাইবেন না ও জুলুম করিবেন না।

(৩১) নিজের হাতে নাড়ি কাটা শরীয়তে কোন বাধা নাই। ইহা হযরত আদম (আঃ) এর সুন্নত হইতেছে। এই নাড়ি কাটাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিলে হযরত আদম (রাঃ) কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়। ইহাতে ঈমান যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

(৩২) কেহ কেহ আপনাকে মারফতি ফকির মনে করিয়া গরুর গোশত, মৎস্য ও কোন হালাল প্রাণী জবেহ করা ও খাওয়া নিষেধ করে। ইহা কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের খেলাফ। যাহারা হালাল প্রাণী জবেহ করিতে ও খাইতে ঘৃণা করে, তাহারা কুরআন শরীফের বিপরীত কার্যকারী, কাজেই তাহারা বেঈমান।

(৩৩) হানাফী, মালেকী, হাম্বলী ও শাফিয়ী—এই চারি মজহাবের কোন মজহাব এহনাত করিবেন না। আমি হানাফী, আমার মুরিদগণও হানাফী। শিয়া, রাফেজী খারেজী ইত্যাদিদের আকিদা বাতিল ও হারাম।

চার মজহাব নহে, চারের মজহাব, চারের মজহাবই হাদীস কুরআন ও ফেকাহ শরীফ হইতেছে। ফেকাহ শরীফ—কুরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফের অনুবাদ মাত্র। যাহা কুরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফে স্পষ্ট-ভাবে তাই তাহারই খোলাছা (মূলমর্ম) ফেকাহ হইতেছে।

অতএব এই চারের মজহাবকে যে এহ্নাত (অবজ্ঞা) করিবে, সে কাফের হইবে। কেননা ইহাতে কুরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফকে অবজ্ঞা করা হয়।

নবী (সাঃ) এর জামানা হইতে আজ পর্যন্ত সকলেই আহলে হাদীস ওয়াল কুরআন হইতেছে। যে আহলে হাদীস ওয়াল কুরআন হইবে, তাহার আমল চারের কোন এক মজহাবের সহিত মিলিবে।

(৩৪) মিলাদ শরীফ কেয়াম করা মোস্তাহসান। যদি কেহ মৌলুদ শরীফ পাঠকালে কেয়াম করে তবে কেহ তাহাকে জবরদস্তি করিয়া বসাইবেন না। যদি কেহ বসিয়া তাওয়াদ শরীফ পড়ে, তবে তাহাকেও কেহ জোর করিয়া উঠাইবেন না। সামান্য মোস্তাহসান বিষয় লইয়া কেহ দলাদলি করিয়া বিভক্ত হইবেন না। কেয়াম করা আমি ভালই মনে করি। কেয়ামের সময় কেহবা বসিয়া থাকে, কেহবা দাঁড়ায়— ইহা ভাল নহে। তৎপ্রতি খেয়াল রাখিবেন। কিন্তু কেয়াম মোস্তাহসান সুন্নতে উম্মত। সুন্নত তিন প্রকার (ক) সুন্নতে উম্মত, (খ) সুন্নতে সাহাবা, (গ) সুন্নতে নববী।

(৩৫) ইল্‌মে গায়েব আল্লাহ্ তায়ালা হযরত নবী (সাঃ)-কে যতদূর জানাইয়া দিয়াছেন, ততদূর জানেন। গায়েবের মালিক আল্লাহ্ তায়ালা, এইরূপ আকিদা রাখিবেন। হযরত (সাঃ) যে গায়েব জানেন, সেই গায়েবকে ইল্‌মে হুছুলি বলে।

(৩৬) দাড়ি রাখা, লম্বা কোরতা পরা ইত্যাদি সুন্নতী লেবাসকে যাহারা অবজ্ঞা করিবে, তাহারা বেঈমান হইবে। হযরত (সাঃ)-এর সুন্নতকে অবজ্ঞা করায় হযরত (সাঃ)-কে অবজ্ঞা করা হয়। হযরত (সাঃ)-কে যে অবজ্ঞা করে, সে কাফের হইবে।

(৩৭) কামেল পীরের নিকট মুরীদ হইলে, পীর যদি মরিয়া যান, বেশরা হন বা দূর দেশবাসী হন, আর তাঁহার নিকট যাইতে অক্ষম হন, তবে কামেল পীর দেখিয়া মুরীদ হইয়া তালিম পাইতে পারিবেন। কিন্তু ভাল পীর থাকা সত্ত্বেও পীরকে অগ্রাহ্য ও অবজ্ঞা করিয়া অন্য পীর ধরিলে ঈমান যাইবার আশঙ্কা আছে।

(৩৮) আমার মুরীদ ও মোতাকেদদিগকে এবং সকল মুসলমানকে বলিতেছি, যদি কোন ব্যক্তি শরীয়ত মোতাবেক আলেম কিম্বা কামেল হন, তবে তাঁহার ওয়াজ শুনিবেন, খাতেরদারী করিবেন, তাহাতে আমার কোন নিষেধ নাই।

যদি কোন আলেম বা ওয়ায়েজ ওয়াজের মধ্যে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রশংসা উপলক্ষে মসনবীয়ে রুমী ইত্যাদি ইল্‌মে মূছিকির ওজনে অর্থাৎ রাগ-রাগিণীসহ পড়ে, তবে তাহার মহফিলে যাইবেন না। গেলে গোনাহগার হইবেন। যদি কেহ গিয়া থাকেন, তবে তাহার কর্তব্য এই যে, তথা হইতে উঠিয়া আসেন।

(৩৯) আমি আলেম ও শিক্ষিত লোকদিগকে মুহব্বত ও তাজিম করিয়া থাকি। আপনারাও তাজিম ও মহব্বত করিবেন। যে আলেম ও সাধারণ লোক শরীয়ত মোতাবেক চলেন, তাহাদিগকে কেহ তুচ্ছ জানিবেন না। তুচ্ছ জানিলে আল্লাহ্ তায়ালা ও হযরত নবী (সাঃ) নারাজ হইবেন; যেহেতু আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিছ।

(৪০) সকলে কুলুখ ব্যবহার করিবেন, স্ত্রী, কন্যা ও পরিজনদিগকে কুলুখ ইত্যাদি আমল করাইতে চেষ্টা করিবেন; যেহেতু কুলুখ ব্যবহার করা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্।

(৪১) মাদ্রাসার তালেবোল-এল্‌মদিগকে যথাশক্তি জায়গীর রাখিবেন ও সাহায্য করিবেন, কিন্তু দাড়ি মুণ্ডনকারী, এলবার্ট রাখা ও হুক্কা বিড়ি-খোর তালেবোল-এল্‌ম রাখিবেন না। পরহেজগার নামাজী তালেবোল-এল্‌ম রাখিবেন। শিক্ষকদিগেরও পরহেজগারী অবলম্বন করিতে হইবে। মাদ্রাসা, স্কুল ও মক্তবে বদকার শিক্ষক রাখিতে নাই।

(৪২) আমার খলিফা ও মুরীদগণের মধ্যে হাজার হাজার আলেম, হাফেজ ও ক্বারী আছেন। তাহারা আমার আদেশে বহু কিতাব ছাপাইয়াছেন ও ছাপিতেছেন। আমি সকলের কিতাব সম্পূর্ণ দেখতে পারি নাই। কাজেই যদি কাহারও কিতাবে শরীয়তের কোন খেলাফ মত লিখিয়া থাকেন, তবে তাহা কেহ আমল করিবেন না। বরং তাহার সংশোধনের জন্য তাহাকে জানাইয়া সংশোধন করিবেন।

(৪৩) ইল্‌ম দুই প্রকার—ইল্‌মে জাহের ও ইল্‌মে বাতেন। ইল্‌মে জাহের শরীয়ত—কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও ফেক্‌হ শরীফ ইত্যাদি। শরীয়ত মোতাবেক আমল করাই তরিকত। তরিকত ব্যতীত মারেফাত হকিকত হইতে পারে না। উহা মিথ্যা বৈ কিছুই নহে। শরীয়ত ছাড়িয়া যাহারা মারেফাত আমল করে, তাহারা ফাছেক। শরীয়ত অনুযায়ী তরিকত, মারেফাত এবং হকিকত শিক্ষা করা ফরজ। যাহারা তরিকত আমল না করে, তাহারা ফাছেক। যাহারা সত্য তরিকত মারেফাত ও হকিকত অবজ্ঞা করে তাহারা কাফের।

(৪৪) কদমবুছি জায়েজ আছে, পীরের পায়ে হাত দিয়া সেই হাতে তা'জিমের জন্য চুম্বন করা বেদয়াতে জায়েজ। মুখ দিয়া কদমবুছি করা সুন্নত। যদি পীর উলঙ্গ থাকেন, আর তখন কদমবুছি করে, তবে জায়েজ হইবে।

(৪৫) আল্লাহ্ ব্যতীত কাহাকেও ইবাদতের সেজদা করা কোফর। তাহিয়্যাতের সেজদা করা হারাম। এই হারামকে যাহারা মোবাহ জানে, তাহারা কাফের। নবী (সাঃ)-এর জামানার পূর্বে রুকুর নাম সেজদা ছিল, তজ্জন্যই নবী (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ 'যেন কেহ সালাম দিবার কালেও পূর্ব জামানার সেজদার ন্যায় মাথা নত না করে।' যাহারা বর্তমানে তাহি-য়াতের (তাজিমের) সেজদা হালাল জানিয়া করে ও লয়, তাহারা কাফের হইবে।

(৪৬) মোরগ বাঁধিয়া খাওয়া সুন্নত। হযরত নবী (সাঃ) উহা বাঁধিয়া রাখিয়া খাইয়াছেন; আমি ও আমার মোতাকেদ এবং সর্বসাধারণ ভাইদিগকে আদেশ করি। 'জাল্লালা' جلالہ মোরগ না বাঁধিয়া খাওয়া মকরূহ তাহ্‌রিমী।

(৪৭) হযরত মুহম্মদ (সাঃ) শেষ নবী। তাঁহার পরে কোন নবী হইবে না। যদি কেহ কোন সময় পয়গম্বরী দাবী করে, তবে সে মিথ্যাবাদী।

(৪৮) বর্তমানে একদল ফকির বাহির হইয়াছে, তাহারা বোগদাদী সেজদা করে, তাহারা উত্তর দিকে সেজদা করিয়া পীর সাহেব পীর সাহেব বলিয়া থাকে; উহা হারাম। উহা জায়েজ জানিলে বেদ্বীন হইতে হয়।

(৪৯) পীর খান্দানেই যে কেবল পীর হইবে, এমন কথা কোন কিতাবে নাই। যিনি শরীয়ত ও মারেফাত ইত্যাদিতে কামেল হইবেন, তিনিই পীর হইতে পারিবেন, যে বংশেরই হউন না কেন।

(৫০) আমার মুরীদ মোতাকেদগণ আমার আদিষ্ট দরূদ ও অজিফা-সমূহ এবং মোরাকাবা ইত্যাদি যথারীতি করিবেন। মিথ্যা কথা বলিবেন না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন না। পর্দা-পুশিদা মতে চলিবেন, সুদ-ঘুষ খাইবেন না, হারাম মাল খাইবেন না, হারাম কার্য—যেমন গান বাজনা করিবেন না ও উহা শুনিবেন না। ঐ সকল হইতে পরহেজ না করিলে 'কল্‌ব' বন্ধ হইয়া যাইবে। মারেফাতের কোন স্বাদ পাইবেন না। শরীয়তের খেলাফ বলিয়া দাবী করিলে খোদার নিকট দায়ী থাকিবেন। আমি ঐরূপ মুরীদ ও খলিফা চাহি না, তাহাদের নিকট কেহ মুরীদ হইবেন না।

(৫১) কেহ শের্‌ক্ গোনাহ্ করিবেন না। যেমন হিন্দুর পূজায় ভেট দেওয়া, পাঁঠা, কলা, দুধ, ইত্যাদি বিক্রয় করা। দিক্‌শূল, গ্রহস্পর্শ, শনি, রবিবার মানিতে নাই। কাহারও মাল হারাইয়া গেলে গণকের বাড়ী

গনাইতে যাইবেন না। ধান চাউলকে মা লক্ষ্মী বলিবেন না। দোয়া করি, আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমান ভাই-ভগ্নীদিগের ঈমান কায়েম রাখুন।

(৫২) বাজারের ভেজাল ঘৃত, দধি, মিষ্টান্ন সাদা চিনি হইতে পরহেজ করিবেন। আমি ঐ সকলের মর্ম যতদূর অবগত হইয়াছি, তাহাতে আমার উচিত হয় যে, সর্বসাধারণের পরহেজগারী অবলম্বন করার জন্য ঐ সকল ব্যবহার করিতে নিষেধ করি।

অমুসলমানদের তৈয়ারী মিষ্টান্ন ইত্যাদি না খাওয়া ভাল। কেননা তাহারা যাহা হালাল জানে, তাহা আমাদের জন্য হারাম, যেমন গোবর, চেনী ইত্যাদি।

(৫৩) কেহ জামাতা হইতে মেয়ে আটক রাখিবেন না। জামাতার সহিত কোন বিষয়ে বিবাদ হইলে, মেয়ে আটক করা হারাম। কেহ কন্যা ও ভগ্নী ইত্যাদি আটক করিবেন না। যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে তাহা মীমাংসা করিয়া শীঘ্র মেয়ে পাঠাইয়া দিবেন।

(৫৪) নিজ স্ত্রীকে কেহ বাপের বাড়ী বা অন্যত্র ফেলিয়া রাখিয়া কষ্ট দিবেন না। তাহাদিগকে পর্দাতে রাখিয়া তাহাদের হক্ যথারীতি আদায় করিবেন, নচেৎ গোনাহ্গার হইবেন।

(৫৫) কেহ হুক্কা, বিড়ি-সিগারেট ব্যবহার করিবেন না। উহা মকরূহ্ তাহরিমী। মদ, গাজা, ভাঙ ও নেশার দ্রব্য হারাম।

(৫৬) গোরস্থানের হেফাজত করিবেন; গোরের উপর দিয়া পথ দিবেন না। গোরস্থানের নিকট পায়খানা প্রস্রাবের স্থান করিবেন না, করিলে গোনাহ্গার হইবেন ও বদ্দোওয়া প্রাপ্ত হইবেন। যথাসাধ্য গোরের হেফাজত করিবেন।

(৫৭) বৃদ্ধ পিতা-মাতার খেদমত করিবেন, তাহাদের সন্তুষ্টির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ও যত্ন করিবেন।"

ইনতিকালের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দৃশ্যাবলী

হযরত পীর সাহেব ইন্তিকাল করেন বাংলা ১৩৪৫ সনের ৪ঠা চৈত্র বৃহস্পতিবার দিবাগত শুক্রবার রাত্র শেষে ভোর ৫ টা ৪৫ মিনিটের সময়। তাঁর নামাজে জানাজা সম্পন্ন হয় ৫ই চৈত্র, শনিবার বিকাল ৫ টায়। ফুরফুরার সুবিখ্যাত দায়রা শরীফের সম্মুখে প্রাচীন গোরস্তানের মধ্যে যে জায়গায় তাঁর পূর্বপুরুষের দুজন অলির মাজার রয়েছে, তার পূর্বপার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়। পীর সাহেব তাঁর ইন্তিকালের প্রায় পঁচিশ বছর আগেই তথায় কাঁচা ইট দ্বারা একটি গোর তাঁর জন্য তৈরী করে রেখেছিলেন এবং অছিয়ত করেছিলেন যে, তাঁকে সম্ভব হলে যেন এই গোরেই দাফন করা হয়। সেই অছিয়ত মোতাবেকই তাঁর দাফন কার্য সম্পাদিত হয়েছিল।

তাঁর জানাজাতে বিভিন্ন জেলার প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক শামিল হয়েছিলেন।

হযরত পীর সাহেবের ইন্তিকালের সময় তাঁর কাছে ছিলেন তাঁর পাঁচ সাহেবজাদা, তাঁর নাতি সৈয়দ দেল্‌ওয়ার হোসেন, কাজী মুহাম্মদ সয়ফুল্লাহ ও সুফী আবদুল জব্বার প্রমুখ।

তাঁকে গোছল দিয়েছিলেন গয়া জেলার শাহ সাহেব, হযরত মওলানা আবদুদ দাইয়ান, ডাক্তার আবদুল মালেক, হযরত মওলানা হাফিজুল্লাহ ও হযরত মওলানা আবু জাফর প্রমুখ।

তাঁকে গোছল দানের সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁর পাঁচ সাহেবজাদা, নোয়াখালীর মওলানা হাফিজুল্লাহ, তথাকার মওলানা মোজাফ্ফর হোসেন, নদীয়ার মওলানা জামালউদ্দীন সিদ্দিকী, কুমিল্লার হযরত মওলানা আবদুল খালেক এম এ, হুগলীর মওলানা হাফেজ নেছার আহমদ, হুগলীর

হাফেজ আবদুল মতিন, নদীয়ার মৌলবী আবু সায়াদাত মুহাম্মদ হোসেন সিদ্দিকী, কলকাতার মৌলবী শফিউদ্দীন, গয়ার শাহ মীর মুহম্মদ আলী, হুগলীর শাহ নূর মুহাম্মদ, হুগলীর হাজী আবদুল মাওলা, হুগলীর মুন্সী মতলুবোর রহমান, হুগলীর মৌলবী সয়ফুল্লাহ, মওলানা দেল্‌ওয়ার হোসেন প্রমুখ।

তাঁর গোছলের পানি এনে দিয়েছিলেন সৈয়দ দেল্‌ওয়ার হোসেন ও আবু সায়াদাত মোহাম্মদ হোসেন সিদ্দিকী।

সাহেবজাদা মওলানা আবু জাফর বলেছেন: "আমি একবার হযরত পীর সাহেবের চেহারা মোবারক, আর একবার কদম মোবারক দেখ্‌ছিলাম। তাঁর দেহ মোবারক থেকে এরূপ নূর প্রকাশ পাচ্ছিল—যা দেখে আমার চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছিল।"

গয়ার শাহ মীর মুহাম্মদ আলী বলেছেন: "গোছল দেবার সময় হুজুরের চেহারা মোবারক থেকে যেন নূর চম্‌কাচ্ছে। কাফন দেবার কালে তাঁর চেহারা লালরঙ বিশিষ্ট, আর দাফন করা কালে তাঁর চেহারা কর্পূরের ন্যায় সাদা ধবধবে দেখ্‌ছিলাম।"

হযরত পীর সাহেবকে গোরে নামানকালে হাজির ছিলেন: পাঁচ পীরজাদা, বরিশালের জবরদস্ত অলি হযরত মওলানা শাহ্ সূফী নেছার-উদ্দীন, নদীয়ার হযরত মওলানা জামালউদ্দীন, মওলানা আবদুদ্ দাইয়ান, হুগলীর মওলানা দেল্‌ওয়ার হোসেন, ঢাকার মৌলবী আবদুস সাত্তার, কলকাতার মৌলবী শফিউদ্দীন আহমদ, হুগলীর সূফী আবদুল জব্বার ও গয়ার শাহ মীর মুহাম্মদ আলী প্রমুখ।

হযরত পীর সাহেবকে কবরস্থ করার সময় কবরের মধ্যে অবস্থানকারী লোকদের হাতে সোপর্দ করেছিলেন উপর থেকে মওলানা দেল্‌ওয়ার হোসেন ও মওলানা জামালউদ্দীন শির মোবারক ধরে, গয়ার শাহ মীর মুহাম্মদ এক হাতে মহাড়া, অন্য হাতে পার্শ্বদেশ ধরে, চতুর্থ পীরজাদা মৌলবী নজমোস্ সায়াদাত কদম মোবারক ধরে।

গয়ার শাহ সাহেব বলেছেন: "আমি যখন পীর সাহেবকে নামাচ্ছিলাম, তখন তাঁর ওজন তিন-চার সের বলে অনুমিত হয়েছিল।"

হযরত পীর সাহেবের অভাবে তাঁর শূন্য মোকামে কাকে কায়েম করা হবে—এ প্রশ্নের মীমাংসা করেন উপস্থিত সভাতে মওলানা ইনায়েতপুরী সাহেব। তিনি ঘোষণা করেন: "হযরত পীর সাহেব বাঙলা ১৩২৯ সালের

ফাল্গুন মাসের ২৩শে রাত্রে হজে রওয়ানা হবার পূর্বে বলেছিলেন : 'ইন্‌শাআল্লাহ্‌ আমি এ বছর হজে যাব, আমার কায়েম, মোকাম আমার বড় ছেলে মওলানা আবদুল হাইকে স্থির করলাম।"

হযরতের জানাজার নামাজের ইমাম কে হবেন—এ নিয়েও জল্পনা-কল্পনা চলছিল। কেউ কেউ বড় পীরজাদাকে, আবার কেউ কেউ মওলানা নেছারউদ্দীনকে ইমাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তখন এ প্রশ্নের মীমাংসা করেছিলেন হযরত পীর সাহেবের দরবারের মস্তান সাহেব। মস্তান সাহেব বলেছিলেন : 'শুক্রবার দিবাগত রাত্রে আমি দায়রা শরীফে হযরত পীর সাহেবকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : "হুজুর, আপনার জানাজার ইমাম কে হবেন ? উত্তরে হুজুর বড় পীরজাদাকে 'ইমাম' হবার নির্দেশ দান করেন'।" মস্তান সাহেবের বর্ণনা মতে বড় পীরজাদা হযরত মওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী জানাজার নামাজ পড়িয়েছিলেন।

গয়ার শাহ সাহেব বলেছেন : "হযরত পীর সাহেবের গোরের কাছ থেকে আমরা একটু দূরে সরে এসেছি, কেবল পীরজাদা মৌলবী নজ্‌মোস্‌ সায়াদাত গোরের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন—এমন অবস্থাতে আমি হযরত পীর সাহেবের গোরের অবস্থা কাশ্‌ফ করার জন্য মোতাওয়াজ্জেহ্‌ হয়ে দেখি : হযরত পীর সাহেব উঠে বসেছেন, আর দুটি দশ-এগার বছরের সুন্দর ছেলে গোরে উপস্থিত হয়েছে। তখন আমি বুঝে নিলাম যে পীর বোজর্গদের কবরে মোনকের নকির ফেরেশ্‌তাদ্বয় সম্ভবত এরূপ আকার ধারণ করেই এসে থাকেন, যেরূপ মালেকুল মওত তাঁদের সামনে সুন্দর আকৃতিতে এসে দেখা দেন। এ অবস্থায় দেখলাম হযরত নবী (সাঃ) বিদ্যুৎগতিতে হযরত পীর সাহেব ও তাদের মাঝে তশ্‌রীফ এনেছেন। হযরত পীর সাহেব নবী (সাঃ)-এর সঙ্গে কথা বলছিলেন। মোনকের নকির কোনরূপ প্রশ্নাদি না করেই চলে গেলেন।"

হযরত পীর সাহেবের ইন্তিকালের আগের দিনের কথা বলতে যেয়ে শাহ সাহেব বলেছেন : 'আমি বৃহস্পতিবার দিন টিকাটুলীতে কাশ্‌ফ অবস্থায় দেখতে পেলাম : আস্‌মানের দ্বার খুলে গিয়েছে, হযরত পীর সাহেব আরশ মোয়াল্লাতে একটি কুরসির উপর বসে আছেন। তাঁর সামনে সাদা নূর দুল্‌ছে। হযরত পীর সাহেব আমাকে বলছেন : "হে শাহ সাহেব, আমার কাছে এস, এ কোন্‌ নূর দুল্‌ছে, তা কি তুমি জানো ? এ-তাজাল্লির নূর।"

বৃহস্পতিবার রাত্রে স্বপ্নে দেখতে পেলাম ফুরফুরা শরীফে বাঁশ কাটা হচ্ছে। সেখান থেকে দু'টো লাশ বের করা হয়েছে। এমন অবস্থায় হযরত পীর সাহেবকে খুঁজতে লাগলাম। দেখি ঃ তিনি একটি বড় দালানে কুরসীর উপর বসে আছেন। হুজুর আমাকে হাতের ইশারা করে বলেন ঃ হে শাহ সাহেব, আমি চলে এসেছি, তুমি তাড়াতাড়ি ফুরফুরা শরীফে চলে এসো।'

আমি ভোরে রওয়ানা হয়ে ফুরফুরা শরীফে পৌঁছে দেখি ঃ হুজুর ইন্তেকাল করেছেন। আরো একজন পরহেজগার মেয়ে লোকও ইন্তেকাল করেছেন।

মওলানা রুহুল আমিন লিখেছেন,—সূফী তাজাম্মুল হোসেন সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র মৌলবী আবু সায়াদাত মোহাম্মদ হোসেন সাহেব বলেছেন ঃ মৌলবী শফি সাহেব কয়েকজন লোকসহ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে একটা কি দুটোর সময় কলকাতার দিক থেকে হাজী ইলাহী বখ্‌শ সাহেবের বাড়ী অতিক্রম করে ময়দানে হাজির হয়ে দেখতে পেলেন ঃ হযরত পীর সাহেবের বাড়ী যেন সাদা ধবধবে হয়ে গিয়েছে, আর যেন এর উপরের অংশে কয়টি 'ডে-লাইট' জ্বালান রয়েছে।

হযরত পীর সাহেবের জামাতা আকুনি নিবাসী মৌলবী কাজী আবদুল মান্নান ও চট্টগ্রাম-নিজামপুরের ইছাখালির মওলানা ইসমাঈল বলেছেন ঃ 'বৃহস্পতিবার রাত্রি একটা কি দুটোর সময় থেকে ফযর পর্যন্ত হযরত পীর সাহেবের বাড়ীর গোরস্থান ব্যাপী নূরে নূরান্বিত দেখতে পেলাম।' জনাব মান্নান ও আঃ সাঃ মোঃ হোসেন সাহেব উভয়েই বলেছেন ঃ 'আমরা সে রাত্রে এক বোজর্গের গোর জিয়ারত করতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরার পথে আমরা হযরত পীর সাহেবের বাড়ীর উপর ডে-লাইটের আলোকের ন্যায় আলোক দেখতে পেয়েছিলাম।' মৌলবী আবদুল মান্নান ও পীরজাদাগণ বলেছেন : 'ইন্তিকালের তিন চার দিন পূর্ব থেকে হযরত পীর সাহেবের চেহারা মোবারক কেবলামুখী হয়ে পড়েছিল, কিছুতেই অন্যদিকে ফিরান যেত না। বাড়ীর লোকেরা শরবত ইত্যাদি দিতে চাইলে তিনি পিছনের দিকে হাত লম্বা করে নিতেন কিন্তু মুখ ফিরাতেন না। কলকাতার ডাক্তার এ, কে, ঘোস পূর্বদিক থেকে পীর সাহেবকে কয়েকবার ডেকে-ছিলেন কিন্তু পীর সাহেব কোন উত্তর দেন নি এবং মুখও ফিরান নি।

হযরত পীর সাহেব কয়েকদিন মোরাকাবা মোশাহাদা সাগরে ডুবন্ত অবস্থায় ছিলেন। এক ধ্যানে এক চিন্তায় তাজাল্লির সমুদ্রে নিমজ্জিত

ছিলেন। এই অবস্থাকে ইস্তেগ্রাক বলা হয়। তাসত্ত্বেও তিনি বেহুঁশ ছিলেন না। কারণ লক্ষ্য করে দেখা গেছে ঔষধের কথা বললে তিনি নাবোধক জবাব দিতেন।

ইন্তিকালের পূর্বে তাঁর অর্থাৎ হযরত পীর সাহেবের ইস্তেগ্রাকের কয়েজ প্রবল হয়ে উঠেছিল। পীরজাদাগণ বলেছেন : 'হজরত পীরসাহেবের ইস্তেগ্রাকের কয়েজ এত প্রবল ছিল যে, আমরা সুরা ইয়াসীন পড়ছিলাম দু'একবার পড়ার পরেই আমরা আর পড়তে পারছিলাম না, আমাদের মুখের কুরআন পাঠ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।' মওলানা রুহল আমিন (রঃ) লিখেছেন : "তখন বড় পীরজাদা বিব্রত হইয়া আল্লাহ আকবর শব্দ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। এই শব্দ বাহিরের লোক শুনিতে পাইয়াছিল। হজরত পীর সাহেবের শরীরের কম্পন এবং উহা হইতে জেক্‌রের শব্দও শুনা যাইতেছিল, এমন কি ঘরের মধ্যে পীর মাতা ও তাঁহাদের শরীরও আল্লাহ্ তায়ালার জেক্‌রে কম্পিত হইতেছিল।"[১]

হযরত পীর সাহেবের কবরের উপর বটবৃক্ষের একটি ডাল পশ্চিম দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। তাঁকে কবরস্থ করার পর এই ডালটি বা শাখাটি আপনা-আপনি পূর্বদিকে ঝুঁকে কবরের উপর ছায়া দিয়ে আসছে।

মওলানা রুহল আমিন লিখেছেন : "খারনার পাঁচ বিবিরিয়া মজ হাফেজ আসগার সাহেব আমাকে বলিয়াছেন : হজুরের ইন্তেকালের রাত্রে আমি বগুড়াতে ছিলাম। কে যেন একজন স্বপ্নযোগে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, হে হাফেজ, ফুরফুরা শরীফ হইতে জান্নাতের আশ্চর্য বস্তু অদৃশ্য হইয়া গেল। ফুরফুরা শরীফে ক্রন্দনের রোল পড়িয়াছে, তুমি তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দাও। তৎপর কয়েক দিবস পর হযরত পীর সাহেবের গোর জিয়ারত করিতে দাঁড়াইলে তথা হইতে আতরের সুগন্ধ পাই।"[২]

মওলানা রুহল আমিনের লিখিত বিবরণ থেকে আরো জানা যায় যে, হজুরের খাদেম মোল্লা আবদুল হাকিম এক জুম্মাবারে হজুরের গোর জিয়ারত করতে যেয়ে এমন তীব্র সুবাস পেয়েছিলেন—যে সুবাস কখনো তিনি এ জগতে অনুভব করতে বা দেখতে পাননি।

১, হজরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী : মওলানা রুহল আমিন।

হযরত পীর সাহেব তাঁর প্রত্যেক বিবির জন্য পৃথক পৃথক ঘরবাড়ী, তাঁদের প্রাপ্য অংশ ও প্রত্যেক ছেলেমেয়ের প্রাপ্য অংশের এমনভাবে ফয়সালা করে গেছেন যে এজন্য আর কাউকে কোনো সময় মাথা ঘামাতে হয় নি। তিনি তাঁদের সকলের হক্ আদায় করে, বাড়ীর বিরাট মাদ্রাসা-গুলো পরিচালিত করে লাখ লাখ লোককে হেদায়ত করে, তালিম তাওয়াজ্জোহ দিয়ে প্রায় ৯৬ বছর সময় অতিবাহিত করে গেছেন। এও এক আশ্চর্য জীবন। তিনি পাঁচ পুত্র, পাঁচ কন্যা ও তিন বিবি রেখে ইন্তিকাল করেছেন।

তাঁর জীবনকালে প্রত্যেক বছর তাঁর সীতাপুরের বাড়ীতে ১০ই চৈত্র 'ইসালে ছওয়াব' হতো। তাঁর ইন্তিকালের পর পীরজাদা মওলানা আবদুল কাদির গয়ার শাহ সাহেবের সঙ্গে এই 'ইসালে ছওয়াব' সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন: 'আমি ছেলে মানুষ, আমি কি এই বিরাট কার্যের আঞ্জাম করতে পারব?' মওলানা রুহুল আমিন বলেন: "রাত্রে পীর জাম্মাজী ও পীর ভগ্নী স্বপ্নে দেখেন: হুজুর পীর কেবলা সাহেব বারান্দাতে তশ্‌রিফ আনিয়া বলিতেছেন, ভাল হউক, আর মন্দ হউক ইসালে ছওয়াব করিতে হইবে।"[৩]

পীরজাদা হযরত মওলানা আবদুল কাদিরের পুত্র—অল্প বয়স্ক বালক আবুল ফারাহ মিয়া ঘুম থেকে জেগে উঠে বলেন: 'আব্বা, দাদাজী বারান্দাতে বসে আছেন।' ছেলের মুখের কথা শুনে আবদুল কাদির সাহেব বল্লেন: 'তোমার দাদাজী কোথায় গিয়েছেন, সে কি তুমি জান না?' আবুল ফারাহ মিয়া বল্লেন: "হাঁ জানি, কিন্তু তিনি এই বারান্দাতে বসে আছেন।"

হযরত মওলানা রুহুল আমিন (রঃ) এই সীতাপুরে অনুষ্ঠিত ইসালে সওয়াবের মিটিং এ ওয়াজ করতে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন: "আমি ১০ই চৈত্র সীতাপুরের ইসালে ছওয়াবের জলছাতে উপস্থিত হইয়া ওয়াজ করি। দুর্বল বলিয়া একখানা লাঠি চাওয়াতে পীরজাদা হযরত পীর সাহেবের হাতের লাঠি আনিয়া দিলেন। পীরজাদা গোশ্‌তভাত রন্ধন হইতেছে—তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছিলেন। ইতিমধ্যে কয়েকবার হযরত পীর সাহেবকে সশরীরে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্যান্বিত হইতেছিলেন, আব্বা বলিয়া ডাকার সঙ্কল্প করিয়াও মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

---

৩ হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী: মওলানা রুহুল আমিন

"মৌলবী আবদুস সবুরের পুত্র মৌঃ তৈয়ব আহমদ মিঞা তথায় পীর সাহেবকে সশরীরে দেখিতে পাইয়া ডাকার সংকল্প করায় পীর সাহেব তাহার মুখে হাত দিয়া ডাকিতে নিষেধ করেন।"[৪]

মওলানা রুহুল আমিন (রঃ)-এর লিখিত বিবরণ থেকে আরো জানা যায় যে, সারেং মোল্লা আবদুল হাকিম শেষ রাত্রে হযরত পীর সাহেবকে কুতুবখানাতে বসে জেকের মোরাকাবা করতে দেখে দৌড়ে যেয়ে তাঁর কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করলে একটি গাছ সামনে পড়ে যাওয়ায় তিনি অদৃশ্য হয়ে পড়লেন।

যশোহরের মোল্লা তোয়াজউদ্দীনও ফজরের সময় হযরত পীর সাহেবকে দহলিজের পূর্ব কামরা থেকে বের হয়ে আসতে দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন ঃ 'হযরত পীর সাহেব তসবিহ হাতে তসবিহ পড়তে পড়তে দহলিজের দিকে আসছেন'। তা দেখেই তিনি 'হুজুর' বলে লাফ দিয়ে কামরা থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। আর হযরত পীর সাহেব অমনি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন।'

হযরত পীর সাহেব বিধবা স্ত্রীলোকদের দান খয়রাত করতে বড় ভালবাসতেন। একদিন হযরত পীর সাহেবের রুহে ছওয়াব রেছানির জন্য মহল্লার বিধবা স্ত্রীলোকদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর কারণ ছিল হযরত পীর সাহেবের বিধবাদের প্রতি দরদ ও মমতাপ্রবণ ভাবধারার বিষয় বিবেচনা। এক ব্যক্তি হযরত পীর সাহেবের জন্য তার পুকুরে একটি মাছ রেখে দিয়েছিলেন। এই বিধবাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা যেদিন করা হয়েছিল, ঠিক এর পূর্বরাত্রে ঐলোকটি স্বপ্নে দেখেন যে, হযরত পীর সাহেব তাঁর নিজের বাড়ীর দিকে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখে তিনি বললেন যে 'হুজুর, কোথায় যাচ্ছেন ? আপনার জন্য আমি একটি মাছ রেখেছি।' তা শুনে হুজুর বলেছিলেন ঃ 'মাছটি কাল আমার বাড়ীতে দিয়ে এসো।' লোকটি ভোরে মাছ নিয়ে হুজুরের বাড়ীতে যেয়ে হাজির হয়ে দেখতে পেলো ঃ তথায় ইসালে ছওয়াবের আয়োজন চলছে। তা দেখে লোকটি খুবই আনন্দ লাভ করেছিল।

বড় পীরজাদা হযরত মওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী বলেছেন ও হযরত মওলানা রুহুল আমিন লিখেছেন : "হুজুর ইন্তিকালের পূর্বে বলিয়াছেন ঃ আমি খাস করিয়া আমার পিতা-মাতার ছওয়াব রেছানি করিতে

৪, হযরত পীর সাহেব কেবলার জীবনী : মওলানা রুহুল আমিন

এত টাকা রাখিয়াছি। তোমরা ইহার বন্দোবস্ত কর। তিনি উহার জন্য একটি দিন ঠিক করিলেন। তিনি বলিলেন, গরুগুলি আমাকে দেখাও। তিনি জিনিসগত্র দেখিয়া আরো কিছু বেশী আয়োজন করিতে বলিলেন। দিন স্থির করিলেন রবিবার দিবস। খোদার মর্জি হুজুরের দাফন কার্য শেষ হইল শনিবার সন্ধ্যার পূর্বে। দূর দেশবাসিগণ সেইরাত্রে ফুরফুরা শরীফ থাকিয়া গেলেন। রবিবার প্রভাতে সেই বিরাট জামায়াত এই ইছালে ছওয়াবের খাদ্য খাইয়া বাটীতে রওয়ানা হইয়া গেলেন। আল্লাহ্ তায়ালা পীর বোজর্গ-দিগকে ভবিষ্যতের কতক ব্যাপার অবগত করাইয়া থাকেন-ইহার নাম কাশ্‌ফ।"[৫]

৫. হযরত পীর সাহেব কেবলার জীবনী : মওলানা রুহুল আমিন

পীরজাদা ও পীরজাদীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) সাহেব পাঁচ সাহেবজাদা ও পাঁচ সাহেবজাদী রেখে ইন্তিকাল করেছিলেন। প্রথম সাহেবজাদা হচ্ছেন হযরত মওলানা শাহ সূফী আবদুল হাই সিদ্দিকী। তিনি বিশিষ্ট অভিজ্ঞ কামেল, হযরত পীর সাহেবের পূর্ণ কামালতের অধিকারী ও বর্তমানে গদীনসীন পীর। বাংলা ১৩২৯ সনের ২৩শে ফাল্গুন হজ্জে যাবার পূর্বে হযরত পীর সাহেব তাঁকে তাঁর খলাভিষিক্ত ঘোষণা করেছিলেন। তিনি অর্থাৎ বড় সাহেবজাদা বিভাগ-পূর্ব যুগে জমিয়তে ওলামায়ে বাংলার সভাপতি ও আমিরোশ শরীয়তে বাংলা ছিলেন। বিভাগ পরবর্তী যুগেও তিনি তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে প্রতি বছরই দু'একবার করে সফর করতে আসেন। ঢাকা মীরপুরে প্রতি বছরই তার নেতৃত্বে অর্থাৎ সভাপতিত্বে ইসালে ছওয়াবের জলসা হয়। হাজার হাজার লোক উক্ত জলসায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসে সমবেত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের পাবনা জেলার পাকশীতেও প্রতি বছর ইসালে ছওয়াবের মিটিং হয়ে থাকে। সেখানেও তিনি তশরীফ রাখেন। সেখানকার লোক যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে তাঁকে বরণ করে নেয়। পাকশীতে ইসলামী মিশনের কার্যাদি পুরোদমে চলছে। মীরপুরেও বিস্তীর্ণ এলাকা ইসলামী মিশনের কার্যাদির জন্য ক্রয় করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশে তাঁর অর্থাৎ বড় সাহেবজাদা হযরত মওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকীর একান্ত প্রচেষ্টায় ঐ দুটি ইসলামী মিশনের হেড অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদেশেও তাঁর বহু মুরীদান রয়েছেন। তাঁর খলিফাগণ তাঁর হয়ে এদেশে তরীকতের কার্যাদি সুসম্পন্ন করে যাচ্ছেন। তাঁর খলিফা দেওয়ান ইবরাহীম হোসেন তর্কবাগীশ তাঁরই নির্দেশে বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকে তরীকত শিক্ষার

মৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে তাসাউফ দর্শন নামীয় পুস্তকাদি রচনা করছেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা থেকে 'নেদায়ে ইসলাম' নামক মাসিক পত্রিকাটি বের হচ্ছে। তরীকত ও ইল্‌মে তাসাউফের প্রচার উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকাটি হযরত মওলানা আবদুল মজীদ কর্তৃক সুসম্পাদিত হচ্ছে। হযরত মওলানা আবদুল মজীদও তাঁর কাছে বাইয়াত হয়ে তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট খলিফা রূপে কাজ করে যাচ্ছেন। বছর দু'এক আগে সাহেবজাদা হযরত মওলানা আবদুল হাই সাহেব হজ্ব করে নিজ বাসভূমিতে ফিরার পরবর্তী পর্যায়ে মীরপুর-ঢাকা সফরে এসেছিলেন। অনেক লোকের মত আমিও তাঁকে দেখার জন্য তাঁর অন্যতম মুরীদ সুফী আবদুল হামিদকে (রছুলপুর নিবাসী) নিয়ে মীরপুর গিয়েছিলাম। তা'জিম সহকারে তাঁর সঙ্গে মুসাফা ও কদমবুছি করেছিলাম। মীরপুরের ইসালে ছওয়াবের মহফিলে তাঁর ওয়াজ শুনে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে পড়েছে, তিনি ওয়াজের মধ্যে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ "আমি এবার হজ্ব ক্রিয়া সমাপ্ত করে দমদম বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করলে আমাকে ইস্তেকবাল করে নেয়ার জন্য দেশবাসী হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান সমাজের কিছু সংখ্যক লোক বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত হয়ে ছিলেন। মুসলমানরা দোয়াপ্রার্থী, বহু হিন্দুও আমার কাছে দোওয়াপ্রার্থী, কয়জন খ্রীস্টানও আমার কাছে দোওয়াপ্রার্থী হয়ে বলেছিলেন ঃ 'হুজুর, আমাদের মকসুদ পূর্ণ হবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোওয়া করুন।' তাদের সকলের কথা শুনে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আরজ করলাম ঃ 'ইয়া আল্লাহ্। এরা সকলেই আমার কাছে দোওয়াপ্রার্থী। তুমি তাদের মনের কথা জান। যা ভালো বিবেচনা কর, তাই করো। তুমি অন্তর্যামী।" পীরজাদা পীর সাহেবের এই ওয়াজ শুনে সত্যিই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। সকলের সঙ্গে আমিও তাঁর কাছে তওবা করে বাইয়াত হয়ে এসেছিলাম সেদিন। আল্লাহ্ আমাকে পানা দিন, সোজা ও সরল পথে কায়েম রাখুন।

দ্বিতীয় পীরজাদা হচ্ছেন ঃ হযরত আল্লামা মওলানা শাহ সুফী হাজী আবু জাফর সাহেব। তিনিও একজন বিশিষ্ট অলিয়ে কামেল এবং বিভাগ-পূর্ব যুগের মুফতিয়ে-জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা ছিলেন। হযরত পীর সাহেব ইল্‌মে লাদুন্নির ফয়েজ তাঁর উপর যথাযথভাবে নিক্ষেপ করেছিলেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের কুতবখানা যখন লুণ্ঠিত হয়েছিল, তখনকার প্রাপ্ত হস্তলিখিত সহিহ্ বুখারী যা হযরত মওলানা শাহ সুফী ফতেহ আলী (রঃ)

সাহেব একশত টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন এবং হযরত পীর সাহেবকে তিনি স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ দান করে গিয়েছিলেন। হজরত পীর সাহেব তা এই দ্বিতীয় পীরজাদাকে দান করে গেছেন। দ্বিতীয় পীরজাদাও কামেলে বাতেন। তাঁর আর এক উপাধি ফখ্রোল্ মোহাদ্দেসীন। তিনি যখন হজ্জ করতে গিয়েছিলেন, তখন আরবের বাদশা সুলতান ইব্নে সউদ তাঁর কথা অবগত হয়ে তাঁকে ইস্তেকবাল করে তাঁর নিজ দরবারে নিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত মওলানা রুহুল আমিনের ভাষায় বিষয়টি সুস্পষ্ট করা যাক। মওলানা রুহুল আমিন লিখেছেন : "গত ১৩৫১ হিজরীতে পীরজাদা ফখরোল মোহাদ্দেছিন মওলানা হাজী আবু জাফর সাহেব হজ্জ করিতে যান। সুলতান ইব্নে সউদ যখন ইহা অবগত হইতে পারিলেন যে বাংলার পীর আরিরোশ শরীয়ত হযরত মওলানা আবুবকর ছাহেবের মধ্যম ছাহেবজাদা আগমন করিয়াছেন, তখন তিনি শাহী ইস্তেকবাল করিয়া তাঁহাকে নিজ দরবারে লইয়া যান। আরও বিভিন্ন দেশের কতিপয় জবরদস্ত আলেমকেও তৎসঙ্গে আহ্বান করেন এবং তথায় তাঁহাদের পানাহারের ব্যবস্থা করেন। ছোলতিয়া মাদ্রাসার পরিচালক মওলানা সাহেব মধ্যম পীরজাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলেন : ছোলতিয়া মাদ্রাসার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বেগম ছোল্তোন্নেছা আপনার ওয়ালেদ পীর সাহেবের আত্মীয়া। তৎপরে তিনি তাঁহাকে মাদ্রাসায় লইয়া গিয়া মন্তব্য বহি বাহির করিয়া জনাব পীর সাহেবের লিখিত মন্তব্য দেখান। পরে জনাব পীর সাহেব কেবলা যে সেই মাদ্রাসাতে এক হাজার টাকা চাঁদা দিয়া আসিয়াছিলেন তাহাও দেখাইলেন।"১

তৃতীয় পীরজাদা হচ্ছেন মখদুম জনাব মওলানা আবদুল কাদির সাহেব। তিনি বিভাগ-পূর্ব যুগের জমিয়তে ওলামায়ে বাংলার সেক্রেটারী ছিলেন। তিনিও একজন অলিয়ে কামেল। তিনি হযরত মোজাদ্দেদ-আল্‌ফেসানী (রঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। তিনি এত বড় কাশ্ফ শক্তির অধিকারী যে হযরত পীর সাহেবের ইন্তিকালের পর তাঁর সীতাপুরের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত ইসালে ছওয়াবের জলসাতে হযরত পীর সাহেবকে তিনি কয়েক বার এই চর্মচোখে দেখতে পেয়েছিলেন। বড় পীরজাদা মধ্যম পীরজাদা ও এই পীরজাদা—এই তিন জনেই হযরত পীর সাহেবের জীবদ্দশায় তাঁর খিলাফত লাভ করে তরীকত শিক্ষাদান করে লোকদের হেদায়েত করতেন।

১. হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী : মওলানা রুহুল আমিন।

পীরজাদী বলেছেন : "হযরত পীর সাহেব ইন্তিকালের কিছুদিন আগে আমাদের পাঁচ ভাইকে হাতে ধরেছিলেন।" আমর ধারণা, মওলানা রুহুল আমিন বলেন, "শেষ সময়ে তিনি পীর ভাইদের উপর সমস্ত বাতেনি মিয়ামতের ফয়েজ নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন।"[২]

চতুর্থ পীরজাদা হচ্ছেন মখদুম হযরত মৌলবী নজমোস্ সায়াদাত সাহেব। মেদিনীপুরের হযরত মওলানা আবদুল মা'বুদ সাহেব বলেছেন : "স্বপ্নে হজরত পীর আবদুল খালেক গেজদেওয়ানী (রঃ) আমাকে বলেছেন : এই পীরজাদা আজন্ম অলি—ولی مادر زاد।"

পঞ্চম পীরজাদা হচ্ছেন মখদুম জনাব মৌলবী জুল্‌ফিকার সাহেব। হযরত পীর সাহেব স্নেহ-ভরে তাঁকে ডেকে বলেছিলেন ঃ "বাবা তুমি দরবেশীতে নিমগ্ন থাক।"

পীরজাদাগণ সকলেই হযরত পীর সাহেবের যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাঁরা সকলেই আজ্ তক লোকদের তরীকত শিক্ষাদান করছেন। আল্লাহ্ তাঁদেরে আমাদের হেদায়েত করবার তৌফিক দান করুন। দীনের খেদমতে নিমগ্ন রাখুন। তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

প্রথমা পীরজাদী বিবাহিতা হয়েছেন ফুরফুরার সৈয়দ মওলানা কানাআত হোসেন সাহেবের সঙ্গে।

দ্বিতীয় পীরজাদী বিবাহিতা হয়েছেন আকুনির মৌলবী আবদুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেবের সঙ্গে।

তৃতীয় পীরজাদী বিবাহিতা হয়েছেন বাঁধপুরের মৌলবী শাম্‌সউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে।

চতুর্থ পীরজাদী বিবাহিতা হয়েছেন সীতাপুরের মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের সঙ্গে।

পঞ্চম পীরজাদী বর্ত্তমানে বিধবা। তার দুই পুত্র ঃ একজন কাজী এহ্‌সান উল্লাহ, আর একজন হচ্ছেন কাজী সায়ফুল্লাহ সাহেব।

২. হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী : মওলানা রুহুল আমিন।

হযরত পীর সাহেবের তরীকতের শেজরা

(ক) হযরত মওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) বাইয়াত হয়েছিলেন কুতবুল ইরশাদ হযরত মওলানা শাহ সূফী ফতেহ আলী (রঃ)-এর কাছে।

(খ) হযরত মওলানা শাহ সূফী ফতেহ আলী (রঃ) বাইয়াত হয়েছিলেন সায়খোল মাশায়েখ হযরত মওলানা শাহ সূফী নূর মোহাম্মদ (রঃ)-এর কাছে।

(গ) হযরত শাহ সূফী নূর মোহাম্মদ বাইয়াত হয়েছিলেন হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রঃ)-এর কাছে।

(ঘ) হযরত সায়িদ আহমদ বেরেলবী (রঃ) বাইয়াত হয়েছিলেন হযরত মওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ)-এর কাছে।

(ঙ) হযরত মওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ) বাইয়াত হয়েছিলেন হযরত মওলানা শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রঃ)-এর কাছে।

এরপর থেকে নক্‌শবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরীকার শেজরা চলে গেছে এক পথে, কাদেরিয়া তরীকার শেজরা চলে গেছে আর এক পথে এবং চিশ্‌তিয়া তরীকার শেজরাও চলে গেছে আর এক ভিন্ন পথে। কিন্তু সকলেরই আদি পীর হচ্ছেন হযরত নবী করীম (সাঃ)। পথ চলতে চলতে দেখা যাচ্ছে সকলেই গিয়ে দাঁড়িয়েছেন হযরত নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এর পার্শ্বে।

একটি মহত্তম ব্যক্তিত্বের অবসান

ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মওলানা শাহ সূফী হাজী আবুবকর সিদ্দিকী (র:) ছিলেন বাংলা-আসামের হাদী, পীরে কামেল ও একজন উচ্চ দরজার ইমাম। প্রায় পৌণে এক শতাব্দী ধরে বাংলা-আসামের আকাশে বাতাসে তাঁর যশোরাশি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। তাঁর মত মহাপুরুষের জন্ম যে কোন দেশের পক্ষে একান্তই গর্বের বিষয়। বিগত ৪ঠা চৈত্র ১৩৪৫ বাঙলা সন মোতাবেক ইং ১৭ই মার্চ, ১৯৩৯ শুক্রবার ভোর পৌণে ছটার সময় প্রায় একশত বৎসর বয়সে তিনি তাঁর ফুরফুরা শরীফের নিজ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের শোকে শোকাভিভূত হয়ে বাঙলা আসামের কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা যে সব শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন, তা থেকে আমরা তাঁর মহত্তম ব্যক্তিত্বের পরিচয়, গণমানুষের উপর অসামান্য প্রভাব প্রতিপত্তির পরিচয় উপলব্ধি করতে পারি। তাঁর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরেই কবি-সাহিত্যিকরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে যে-সব কবিতা রচনা করেছিলেন ও বক্তব্য পেশ করেছিলেন তা থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। কবি শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী লিখেছিলেন ঃ

বাজল শিঙ্গা ইস্রাফিলের আসমানে ঐ অকস্মাত
বাংলার বুকে একি মাতম হায় কি দারুণ বজ্রাঘাত।
বইল বায়ু হা-হুতাশার, নামল নভ অশ্রুধারা
সূর্য গেল অস্তাচলে ডুবল দুঃখে চন্দ্র-তারা।
কাঁদল মাটি গোরস্তানের, কাঁদছে বঙ্গ-মুসলমান
কোটি ভক্ত স্তব্ধ শোকে হারিয়ে আজি শিরস্ত্রাণ।
কুটির থেকে হর্ম্য-বুকে বইছে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
বাঙলা থেকে ব্রহ্ম আসাম সব খানেতেই শোকোচ্ছ্বাস।

কবি তালিম হোসেন তাঁর শোক গাথায় বলেছিলেন ঃ

বাঙালি ! তোমার কামেল ফকির
বুচ্চা আব্বা আবুবকর
কোন্ দৌলত রেখে গেল আজি
মন হতে তার লহ খবর।
হৃদয়ের মাটি খুদে দেখো ভাই
গুণী মুর্শিদ পীর তোমার
কি অফুরন্ত রেখে গেছে ধন
শোধ নাহি তার, নাহি শুমার !

নদীয়া-শান্তাহারের মহিলা কবি বেগম আলরাফ আলী বি-এ তাঁর শোক গাঁথায় গেয়েছিলেন ঃ

নিবে গেছে দীপ, ঘুচে গেছে আশা
মুছে গেছে স্মৃতি, বাক্‌হীন ভাষা,
থেমে গেছে বীণ
সুধা সুর লীন,
গাহে না রাগিণী মেঘনাদ-ধারা
ফুটে না গগনে রবি শশী-তারা।
সহে না সহে না হেন জ্বালা আর
ছিঁড়ে গেছে হায় সাধনার তার।
পীর শিরোমণি নয়নাভিরাম
গেছে জান্নাতে লইতে বিরাম
অভাবে তাঁহার
তায়াজ্জোর দ্বার
কে খুলিবে আর দীন দুনিয়ার
নিবে গেল দীপ সারা বাঙলার।"
(দীপ নির্বাণ)

খুলনা-বেদকাশীর কবি মোহাম্মদ ইবাদুল্লাহ হযরত পীর সাহেবের ওফাতে শোকাভিভূত হয়ে যে গাথাটি রচনা করেছিলেন তার কিয়দংশ ঃ

লাখো লাখো মানব-চোখে বহাইয়া নীর
সোনার বাংলা আঁধার করে কোথায় গেলে পীর

বঙ্গ আসাম তোমার শোকে
ভাসতেছে হায় অঝোর চোখে
কল্‌জে চুয়ে খুন ঝরিছে, লেগে শোকের তীর
সোনার বাংলা আঁধার করে কোথায় গেলে পীর।
অমিয় মাখা মধুর বাণী কে শুনাবে আর
মায়া নদীর উর্মি কেটে করবে কেবা পার,
আধ্যাত্মিকের সূক্ষ্ম তত্ত্ব
কে শুনাবে নিত্য নিত্য,
সুপ্ত হৃদি জাগাবে আর কোন্ সে তাপস ধীর
সোনার বাংলা আঁধার করে কোথায় গেলে পীর।
(সেরা পীরের অন্তর্ধান)

নদীয়া-চেংগাড়ার কবি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ কাব্য-বিনোদ লিখেছিলেন ঃ

"বঙ্গের পীর হে আবু বকর
কি দিয়া শোধিব তোমার ধার
কাতর মনের কাতর কাহিনী ছাড়া
কিছুই নাহিক আর।
জান্নাত হইতে তাম্বাযা শাহাদ
সতত করিও ধরায় দান
বঙ্গ কাঙ্গাল ভক্ত নিচয়
পরান ভরিয়া করিবে গান।"

মোল্লা মোহাম্মদ ইসহাক 'মোস্‌লেম' পত্রিকায় লিখেছিলেন ঃ

"আজি,
ইস্‌লাম কাঁদে কাঁদে আস্‌মান, রবি শশী গ্রহতারা
আকাশের পথে উল্কা ছুটেছে, কি যেন কি তারা হারা
নাই নাই, নাই-দুনিয়ায়, নাই যুগ সেরা মহা-পীর,
রতন মানিক হারায়ে গেলরে বিপুল এ ধরণীর।

সেদিনের মুসলিম বঙ্গ ও আসামের আপামর মানুষের শোকধারা সরিত প্রতিসরিত হয়েছে এসব কবিতায়—বিয়োগ গাথায়। ফুরফুরার এই হযরতকে বলা হয়েছে ঃ "ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মবীর, বাঙলার শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ, সিদ্ধ তাপস ও একচ্ছত্র ধর্মগুরু।"

আমরাও দেখছি তিনি ছিলেন ইনসান-ই-কামিল--পরিপূর্ণ আদর্শ মানব। তাঁর কর্ম ধারার সঙ্গে সুধী পাঠকদের সুপরিচিত করে তুলবার জন্য ভারতের বিশিষ্ট ইংরেজী দৈনিক স্টেট্‌সম্যানের মন্তব্যটিও এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি। হযরত পীর সাহেবের ইন্তিকালের পরবর্তী দিবসেই 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' বলেছিলেন: "মওলানা শাহ সুফী হাজী মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীক সাহেব ছিলেন এদেশের অগণিত মুসলমানের ধর্মগুরু এবং আধ্যাত্মিক জগতের খাঁটি পথ-প্রদর্শক। মওলানা সাহেবের নাম মুসলিম বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত। তিনি স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং দেশের ও দশের কল্যাণকর বহু প্রতিষ্ঠানের ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। স্বীয় ধর্মানুরক্তি ও বদান্যতার জন্য তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন।"—১৮ই মার্চ/১৯৩৯।

তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দেবার জন্য আমরা তাঁর মুখমুগ্ধ মুরীদানদের মন্তব্যাদিই শুধু এখানে উদ্ধৃত করে দেখাব না, তাঁর আদর্শ ও কর্মধারার সঙ্গে যাঁরা সকল সময় এক মতও পোষণ করতেন না, মাঝে মাঝে বিরূপ মনোভাবও পোষণ করতেন এমন দু'চার জন খ্যাতনামা লোকের কথা ও মন্তব্যের উদ্ধৃতি দেবো। হযরত পীর সাহেবের ইন্তিকালের পর মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান দৈনিক আজাদে লিখেছিলেন:

> ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু, ধর্মবীর, বাংলার শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ, আমারে শরীয়তে বাঙলা হযরত মওলানা শাহ সুফী হাজী মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব গত ৯৭ই মার্চ ১৯৩৯, শুক্রবার ভোর পৌণে ছয় ঘটিকার সময় প্রায় একশত বৎসর বয়সে ফুরফুরাস্থ স্বীয় বাসভবনে ইন্তিকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে.....।

মরহুম পীর সাহেবের মহাপ্রয়াণে বাংলা তথা ভারতীয় মুসলমানদের যে বিরাট ক্ষতি হইল সহজে তাহা পূরণীয় নহে। মরহুম পীর সাহেব আজ নশ্বর ধরাধামের সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে চিরমুক্ত। লক্ষ লক্ষ মুরীদ মো'তাকেদীনের চক্ষুর অগোচরে আজ তিনি তাঁর প্রিয় মা'বুদের দরবারে হাজির। বাংলার মুসলমানদের এই দুরিষহ শোক-মুহূর্তে আজ আমরা মরহুম মওলানা সাহেবের পবিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিব।

আজ আমাদিগকে ধীর চিত্তে অনুধাবন করিতে হইবে যে, কি কারণে লক্ষ লক্ষ মুসলমান মরহুম পীর সাহেবের নিকট আধ্যাত্মিক দীক্ষাগ্রহণ করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিত, কিসের বলে মরহুম মওলানা সাহেবের ব্যক্তিত্ব এত অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছিল। মরহুম মওলানা সাহেব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে 'তাছাওফ' বা আধ্যাত্মিক তথ্য সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। পবিত্র ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার সহিত 'তাছাওফ' বা আধ্যাত্মিক তথ্যের যতখানি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে, পৃথিবীর বোধহয় অপর কোন ধর্মের সহিত তাছাওফের ততখানি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। বস্তুত ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা সম্যক-রূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে, আমরা দেখিতে পাইব যে, ইস্‌লামই প্রকৃত 'তাছাওফ' বা আধ্যাত্মিক ধর্ম। ইসলামের প্রত্যেকটি আদেশ-নিষেধই তাছাওফের এক একটি অঙ্গ বিশেষ।

ইস্‌লামের ইতিহাসে আমরা যত অধিক সংখ্যক পীর-আওলিয়া বা আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের সন্ধান পাই, পৃথিবীর কোন ধর্মের ইতিহাসে তাহা সম্ভবপর নহে। পৃথিবীর দিকে দিকে এই আধ্যাত্মিক মুসলমান-গণের সাধনার ফলে ইসলামের আলো যত অধিক বিকীর্ণ হইয়াছে, দণ্ডমুণ্ডের মালিক রাজাধিরাজগণের দ্বারা তার শতাংশের একাংশও হয় নাই। আজিকার দিনেও পৃথিবীর মুসলমানগণ, এমন কি স্থান বিশেষে অমুসলমানগণেরও মস্তক ভক্তি শ্রদ্ধায় এই পীর-আওলিয়াগণের নিকটে অবনত না হইয়া পারে না। মরহুম পীর সাহেবের পবিত্র জীবনী আলো-চনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, তিনি কিভাবে সত্যিকার ইস্‌লামের পথে মুসলমানগণকে পরিচালিত করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায়-নিষ্ঠা, তাঁহার বিনয়, তাঁহার শিশুসুলভ মধুর ব্যবহার, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের পথে তাঁহার কঠোর নির্দেশ প্রভৃতি দ্বারা বাংলার মুসলমানদের চোখের সামনে পবিত্র ইস্‌লামের এক সুন্দরতম রূপ ফুটিয়া উঠিল---তাঁহার সংস্পর্শে একদল লোক সঠিকভাবে ধর্মের পথে পরিচালিত হইতে লাগিল।

মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ, জাতীয় সংহতি-শিক্ষা, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতিরও যে আবশ্যকতা রহিয়াছে, তাহা আমরা পীর সমাজ হইতে একমাত্র মরহুম মওলানা আবুবকর সিদ্দীক সাহেবের মুখেই শুনিয়াছি। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে বিভিন্ন দিকে

বাংলার মুসলমানগণকে কর্মের পথে টানিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার মুরিদগণ সাধারণতঃ ধর্মভীরু ও আধুনিক ভাবসম্পন্ন। তাঁহার মুরিদগণ কর্তৃক পূর্বেও বাংলাদেশে একাধিক সংবাদপত্র পরিচালিত হইয়াছে, বর্তমানেও হইতেছে। তাঁহারা অনেকেই আজ বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন।

মরহুম পীর সাহেব ভণ্ড পীরদের ন্যায় পোলাও কোর্মা খাইয়া আর মুরিদদের নজর-নিয়াজ গ্রহণ করিয়াই পীর সাজেন নাই। তিনি বরং আরাম আয়েশ ত্যাগ করতঃ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী বাংলা আসামের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ইসলাম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। মুসলিম সমাজের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, তিনি বীরের ন্যায় সেখানে উপস্থিত হইতেন। মাত্র এক বৎসর পূর্বের ঘটনা :—পীর সাহেব দুরন্ত বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত। কলিকাতার টিপু সুলতান মসজিদের পার্শ্বে হিন্দুদের এক প্রকার মূর্তি স্থাপনের ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি হওয়ার পর, তিনি রোগগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় মুসলিম ইনষ্টিটিউটে কঠোর ভাষায় উক্ত ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, একমাত্র তাঁহারই প্রতিবাদে উক্ত ব্যবস্থা রহিত হইয়াছিল। ইহা তাঁহার পবিত্র জীবনের একটি নগণ্য ঘটনা মাত্র।

"মরহুম পীর সাহেব জীবনে অনেক লাওয়ারিশ মুর্দার দাফন কাফনের ব্যবস্থা স্বহস্তে করিয়াছিলেন। অনেকবার শুনিয়াছি যে তাঁহার মুরিদগণ চেষ্টা করিয়াও এই সকল কাজ তাঁহার হাত হইতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাহার ধর্মনিষ্ঠা, ত্যাগ, কর্তব্যপরায়ণতা, খোদাপ্রেম, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি ব্যতীত তাঁহার একমাত্র নম্র ব্যবহারই তাঁহার ব্যক্তিত্বকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ছিলেন শিশুর ন্যায় সরল। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে জীবনে অন্ততঃ একবারও সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহারই তাহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি শত্রু মিত্র সকলকে সমানভাবে দেখিতেন। কাহারও শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে তিনি কখনও প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অহর্নিশি তাঁহার মুরিদ মোতাকেদগণকে নিঃস্বার্থভাবে সত্য ও ন্যায়ের সেবা করিয়া যাইতে উপদেশ দিতেন। ধৈর্য ও সহনশীলতা তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আজ তিনি জীবনের পরপারে। তাঁহার পবিত্র চরিত্র বৈশিষ্ট্যই চিরকাল আমাদিগকে সত্য ও মনুষ্যত্বের পথ প্রদর্শন করিবে।"

"জনাব মোস্তাফিজুর রহমান তাঁর আলোচনায় অতি সত্য কথাই বলেছেন। মরহুম পীর সাহেবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বাংলা-আসামের মুসলমানদের যথেষ্ট কল্যাণ করেছিল অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্কুল কলেজ 'বয়কট' করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল, তখন তিনি এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এই বলে যে, স্কুল কলেজ বয়কট নীতি মুসলমান ছেলেদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বনাশ করে দেবে। কিন্তু হিন্দু ছেলেদের কোনই ক্ষতি হবে না। কারণ তারা দু'দিন পরেই স্কুল কলেজে ঢুকে যাবে আবার, মুসলমান ছেলেরা কিন্তু আর স্কুল কলেজে ফিরে যাবে না। কার্যতঃ হয়েছিলও তাই। তাঁর নির্দেশ উপেক্ষা করে যারা স্কুল কলেজ বয়কট করেছিল-তাদের আর পড়াশুনা হয়নি। ফুরফুরার এই রাজনীতিক জ্ঞান বিশিষ্ট পীর সাহেবের কাছে মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত অনেক সময় এসে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ প্রার্থনা করেছেন। তাতেই বুঝা যায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিক প্রজ্ঞা কত গভীর ছিল। এ সম্পর্কে সাপ্তাহিক 'মোসলেম' এর সম্পাদক মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেব লিখেছিলেন ঃ "দেশের সর্ব সাধারণের উপর মহামান্য পীর সাহেবের এরূপ অসাধারণ প্রভাব ছিল যে, বিগত অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের সময়ে মিঃ গান্ধী ও মিঃ সি, আর দাসের মত লোককেও পীর সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত মওলানা মোহাম্মদ আলী যখন কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন, তখনও তিনি একাধিকবার মহামান্য পীর সাহেবের পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অথচ হযরত পীর সাহেব জীবনকে কখনও কংগ্রেস, অসহযোগ অথবা ঐরূপ কোন অনৈসলামিক অনিষ্টকর ও উগ্র আন্দোলনে যোগদান করেন নাই।

মওলানা আকরম খাঁ সাহেব ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের সঙ্গে প্রায় সময়ই তাঁর সকল কাজ ও মতামতের সঙ্গে একমত বা ঐকমতে পৌঁছতে পারতেন না। তিনিও তাঁর ইন্তিকালের পর দৈনিক আজাদে লিখেছিলেন ঃ

"মওলানা আবুবকর সাহেবের ইন্তিকালে অন্ততঃ অর্ধ শতাব্দীব্যাপী একটা কর্মজীবনের ও ধর্ম সাধনার অবসান ঘটিল। নওয়াবী আমল দারীর শেষ অবস্থায় মোস্‌লেম জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে নানা কারণে যেসব অবসাদ ও অভিশাপের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-

নীর প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মোছলেম বঙ্গ স্বদেশী ও বিদেশী আমলাতন্ত্রের বৈরী মনোভাবের নিষ্ঠুর প্রভাবে যখন একেবারে বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই অবজ্ঞার বিক্ষেপ ও আত্ম-বিস্মৃতির সুযোগে বাংলা সাহিত্য ও ইংরাজী শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া বাংলার দিশাহারা মুছলমানকে নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি ঐতিহ্য, ভাবধারা ও আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং বিদ্রোহের রাজপথ ধরিয়া বিদেশী বিধর্মী ও বিজাতীয় চিন্তাধারা যখন মোসলেম বঙ্গের মনও মস্তিষ্ক আবিষ্ট ও অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সময় ইসলামের প্রাণশক্তি ও মুসলমানের জাতীয় আত্মা এই অনাচারের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠে। নবযুগের প্রথম সূচনার এই শুভ প্রভাতে জাতির তৎকালীন শোচনীয় পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের তুমুলতুফান তুলিয়াছেন পুঁথি সাহিত্যের কয়েকজন ভক্তিভাজন লেখক এবং বাংলা তথা ভারতের কতিপয় প্রাতঃস্মরণীয় আলেম। তাঁহাদের আন্তরিক সাধনা ও জীবন-ব্যাপী জেহাদের ফলে মোছলেমবঙ্গের দিকে দিকে অনুভূতি ও ভবিষ্যৎ ভাবনায় যে প্রয়োজনীয় চেতনা দুর্বার গতিতে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, মওলানা শাহ সুফী পীর আবুবকর সাহেবও সেই যুগচেতনারই একটি শুভ অভিব্যক্তি। সব সময় তাঁহার সকল কাজ ও মতামতের সহিত সকলের মত ঐক্য হয়তো নাও থাকিতে পারে কিন্তু একথা বোধহয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, জনাব মওলানা সাহেবের মরহুমের অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী সাধনা ও প্রচারের ফলে বাংলার আত্ম-বিস্মৃত, স্বধর্মবিমুখ ও পরধর্মের প্রবাহ হত লক্ষ লক্ষ মুছলমান আবার সত্যকার ইছলামের সুশীতল ছায়ায় ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে। আপনাদিগকে মুছলমান বলিয়া পরিচিত করিয়া এবং নিতান্ত অসঙ্গত ভাবে হানাফী মজহাবের দোহাই দিয়া বাংলার যে অসংখ্য মুছলমান নানাপ্রকার জঘন্য শের্ক-বেদ্য়াতে লিপ্ত হইয়া নিজেদের ধর্ম ও ধর্ম বিশ্বাসের সর্বনাশ করিয়া বসিয়াছিল, মওলানা আবুবকর সাহেব তাঁহাদের অনেককে ঐ অনাচারের অভিশাপ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিকের অসাধারণ তৎপরতার পরিচয় দিতে যাওয়া আজ আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহার

অমায়িক ব্যবহার, তাঁহার অসাধারণ' আখলাক' এবং আমাদের প্রতি তাঁহার অশেষ স্নেহের বর্ণনা করিতে যাওয়াও আজ আমাদের সাধ্যাতীত। তাঁহার লক্ষ লক্ষ মুরীদ ও গুণমুগ্ধ ভক্তের ন্যায় আমরাও আজ এই বিরাট অসাধারণ ব্যক্তিত্বের তিরোধানে শোকে অভিভূত। এই প্রায় শত বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের অন্তর বাহিরে ইছলামের দুর্ধর্ষ প্রাণ শক্তির যে অনুপম যৌবন চাঞ্চল্য বিগত তিন যুগ হইতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, বাংলা হইতে তাঁহার চির অবসানে বস্তুতঃই আমরা আজ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। শোক প্রকাশ ও সহানুভূতি জ্ঞাপনের সাধারণ ধারার অনুসরণ করিতে যাওয়ারই তাই কোন সঙ্গতি বা আবশ্যকতা আজ আমরা অনুভব করিতে পারিতেছিনা।

মওলানা মরহুমের ইন্তেকাল আমাদের মতে সমগ্র মোছলেম বঙ্গের জাতীয় মাতম, এ মাতমের শোকে সকলেই আজ সন্তপ্ত, সকলেই গভীর ভাবে অভিভূত। আজিকার দিনের একমাত্র কর্তব্য—অযুত অযুত অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা, কোটি কোটি মোছলেম কণ্ঠের আগ্রহাকুল মোনাজাত। জীবন-মরণ সমস্যার সকল দর্শন ও দার্শনিকতার মর্মবাণী আজিকার এই শোকের দিনে কোরআনের সত্য, সুন্দর ও সনাতন ভাষায় কণ্ঠে কণ্ঠে গুঞ্জরিয়া ও মর্মে মর্মে মুঞ্জরিয়া উঠুক ঃ—ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন'।"

হযরত পীর সাহেবের ওফাতে মওলানা আকরম খাঁ সাহেব যে হৃদয় নিঙড়ানো মাতম-জারি প্রকাশ করেছিলেন, তাতেই তাঁর মহত্তম ব্যক্তিত্বের কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলার এই তাপসকুল-শিরোমণির ইন্তেকালকে মওলানা আকরম খাঁ সাহেব 'জাতীয় মাতম বলে উল্লেখ করেছেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে এ সম্পর্কে একমত পোষণ করি। তাঁর অর্থাৎ হযরত পীর সাহেবের ইন্তিকালের পর যে সমস্ত খ্যাতিমান সাহিত্যিক, শিল্পীও সাংবাদিক হযরত পীর সাহেবের কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছিলেন, তন্মধ্যে ফুটে উঠেছে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাঁর জীবন-দর্শন, তাঁর বলিষ্ঠ আধ্যাত্মিক ও রাজনীতিক প্রজ্ঞার পরিচয়। মাসিক "হুন্নত-অল-জামায়াত" পত্রিকায় মৌলবী আবদুল ওহাব সিদ্দিকী সাহেব যে আলোচনা করেছিলেন তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছিলেন ঃ

সত্যই পীর সাহেব একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন। তাঁহার ধর্ম ও কর্মময় জীবন যে কতখানি গৌরবোজ্জ্বল ছিল, আমাদের ন্যায়

লোকের পক্ষে তাহা ধারনার বহির্ভূত। তিনি আদর্শ জীবন লইয়া দুনিয়ায় আসিয়াছিলেন এবং জীবনের প্রতি মুহূর্তে সেই আদর্শবাদের পূর্ণ মহিমা দেখাইয়া গিয়াছেন। মোছলেম বাংলাকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য তিনি নানাবিদ প্রতিষ্ঠানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

'আঞ্জুমানে-ওয়ায়েজিনে বাংলা,' জমিয়তে 'ওলামায়ে বাংলা' প্রভৃতি সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের মারফত মরহুম পীর সাহেব কেবলা বাংলার মুছলমান সমাজকে সরল পথে পরিচালিত করিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। এতদ্‌ব্যতীত ফুরফুরার ইছালে-ছওয়াবের বার্ষিক অনুষ্ঠান তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। লক্ষ লক্ষ মুছলমানের প্রতিবৎসর বিনা দাওয়াতে একস্থানে সমবেত হইবার দৃশ্য অতি বিরল। পীর সাহেব কেবলার পুণ্যময় স্মৃতির কূলে দাঁড়াইয়া আজ আমাদের মনে পড়ে অতীতের বহু কথা। মনে পড়ে পীর কেবলার অনাবিল চরিত্র মাধুর্য, ধর্মপথে দুর্জয় সিংহবিক্রম, সংসার ক্ষেত্রে আদর্শ সংসারী। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, শিশুর ন্যায় সরল প্রাণের অভিব্যক্তি অতি দুশ্‌মন হৃদয়ও বিগলিত না হইয়া পারে নাই। মুহূর্তের জন্য যে ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিয়াছে — এই মহামানবের পায়ে।

আহ্‌লে সুন্নত্-অল্ জামায়াতের প্রকৃত মতের প্রতিধ্বনি করাই মরহুম পীর কেবলার চরমও পরম লক্ষ্য ছিল। তিনি নিজে কোনদিনই শরীয়তের পথ হইতে চুল পরিমাণ পদস্খলিত হন নাই। তাঁহার কোন মুরীদ মুতাকেদকেও সামান্য পরিমাণ ত্রুটি দেখিলে অতি মিষ্ট কথায় তাঁহার সেই দোষত্রুটি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।"

প্রাক্তন এম, এল, এ, খান বাহাদুর হাজী মওলানা আহমদ আলী হব "শরিয়ত ইসলাম" পত্রিকায় লিখেছিলেন ঃ

ফুরফুরার পীর, যাঁহার নাম মানুষের ঘরে ঘরে একান্ত সম্মানের সহিত ধ্বনিত, যাঁহাকে দেখিবার জন্য, যাঁহার একটি কথা শুনিবার জন্য, যাঁহার নিকট একটু দোয়া লইবার জন্য নগরে নগরে পল্লী প্রান্তরে অসংখ্য লোকের ভিড় লাগিয়া যাইত; যাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, মহত্ব, ও পীযূষ প্লাবনী ওয়াজ বিগত প্রায় সত্তর বৎসর ধরিয়া সমান ভাবে দেশ বিদেশে সব চেয়ে বড় শ্রদ্ধার বিষয় হইয়াছিল, সত্যিকার ইসলামের বার্তাবাহী সেই বীর সেনানী এই

নশ্বর দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কোরআন শরীফের মণি-মঞ্জুষা বা ইল্‌মে তাছাওফের মরকত মণি হাকিকতে কাবার পূর্ণ বিকাশ, ইল্‌মে জাহের ও ইল্‌মে বাতেনের সেই অফুরন্ত 'খাজিনা' দুনিয়ার লোক চক্ষুর আড়ালে চলিয়া গিয়াছেন।"

হযরত মওলানা মঈজ উদ্দীন হামিদী সাহেব 'হেদায়ত' পত্রিকায় লিখেছিলেন ঃ

"মহামান্য পীর সাহেব কেবলার ইন্তিকালে বঙ্গদেশ তথা সমগ্র মোসলেম ভারত একজন অভিজ্ঞ আলেম এবং অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন পীরহারা হইল। সমস্ত ভারতে ধর্মনীতি, রাজনীতি ও অন্যান্য জাতীয় আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এরূপ অসাধারণ প্রভাব সম্পন্ন ও সর্বজন মান্য আলেম ও পীর আর কেহই নাই। বঙ্গদেশে তিনিই সর্বপ্রথম 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন' ও 'আঞ্জুমানে ওলামা, প্রতিষ্ঠা করিয়া আলেম সম্প্রদায় ও মোসলেম জনসাধারণের মধ্যে নবজীবন ও নবচেতনার সঞ্চার করিয়াছিলেন। 'জমিয়তে-ওলামায়ে বাঙলা ও আসামের' তিনিই একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক ও স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। তিনি বঙ্গে খেলাফত আন্দোলন ও মোসলেম লীগেরও সর্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইসলামী জাতীয় সাহিত্য এবং জাতীয় সংবাদ পত্রের সহিত ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। 'মিহির ও সুধাকর,' ইছলাম প্রচারক,' 'মোসলেম হিতৈষী,' 'ইসলাম দর্শন ও 'হানাফী' পত্রিকারও তিনি সর্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে বহু মাদ্রাছা মকতব, মছজেদ, স্কুল ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্‌ভিন্ন তাঁহার সহায়তায়ও অনুমোদনে তাঁহার মহাবিজ্ঞ খলিফাগণের দ্বারা বাঙলা ভাষায় শরিয়ত, তরিকত ও মারেফাত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় এক সহস্র ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

মহামান্য পীর সাহেব কেবলার ধর্ম ও সমাজ হিতৈষণামূলক শেষকীর্তি 'জমিয়তে ওলামায় বাঙলার' পূর্ণগঠন এবং 'মোসলেম'

মাসিক জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র প্রচার। তিনি কলিকাতা 'মাদ্রাছা-আলীয়ার' একজন সদস্য ও মোছলেম শিক্ষা বোর্ডের এড্ভাইসারী সভাসদ ছিলেন।

হজরত পীর সাহেব কেবলা চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার জীবনব্যাপী ধর্মসাধনা ও কর্মজীবনের অসংখ্য পুণ্যস্মৃতি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত সাহেবজাদাগণ, বঙ্গ আসামব্যাপী তাঁহার অসংখ্য আলেম খলিফা, ফুরফুরা নিউস্কীম জুনিয়র মাদ্রাসা, ওল্ড স্কীম ও নিউস্কীমের দুইটি সিনিয়ার মাদ্রাসা, তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের খনিস্বরূপ 'দারেরাশরীফ' ইছালে ছওয়াবের বার্ষিক মহফিল, দাতব্য চিকিৎসালয়, তাঁহার প্রস্তাবিত খানকা শরীফ ও জমিয়তে ওলামায়ে বাঙলা সমস্তই তিনি বাঙলার মোসলমানদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।"

হযরত মওলানা রুহুল আমিন (রঃ) সাহেব লিখে গেছেন ঃ

"সংসারের কর্ম-কোলাহল যে আধ্যাত্মিক পথে প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারেনা,--- পীর সাহেব দীর্ঘজীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। একাধিক বিবি, পুত্র, পৌত্র, কন্যা প্রভৃতিতে ভরপুর সংসারে থাকিয়া তিনি আধ্যাত্মিকতার যে কত উচ্চ গিরি শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন,সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা ধারনার বহির্ভূত। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন আদর্শ ধর্মবীর, অন্যদিকে সেইরূপ অপরাজেয় কর্মনীতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষ সায়াহ্নেও দেশের ও দশের কার্যে তাঁহার অফুরন্ত উদ্যম-উদ্দীপনায় আদৌ দুর্বলতা আসে নাই। গত নির্বাচনের সময়ে তিনি স্বশক্তি লইয়া বাংলার কেন্দ্রে কেন্দ্রে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার অদম্য প্রচেষ্টায় এবং আন্তরিক দোয়ার বরকতে লীগপার্টি ও জমিয়তে ওলামার মনোনীত সদস্যগণ অধিক সংখ্যায় নির্বাচন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্মের সহিত কর্মের যে কি ঘনিষ্ট সম্পর্ক, পীর সাহেবের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনা হইতেই আমরা তাহার

পরিচয় পাই। ফলতঃ এইরূপ সর্বতোমুখী প্রতিভা এবং সর্বগুনের একত্র সমাবেশ এই যুগে অতি বিরল।"

উপর্যুক্ত আলোচনা ও মন্তব্যাদিতেই রয়েছে মোসলেম ভারতের অদ্বিতীয় অলিয়ে কামেল, বাঙলা ও আসামের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও হাদী, সর্বজন মান্য পীরে কামেল, আমীরে শরীয়ত হযরত মওলানা শাহসূফী মোহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দীক (রাঃ)-এর মহত্তম ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর, তাঁর বিভিন্নমুখী কর্ম ও ধর্মসাধনার নজির।

———